জলবায়ু সহনশীল ও প্রতিবেশভিত্তিক

উপকূলীয় জীবিকায়ন

বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

জিসিএ সম্মেলনে "বনজ-ফলদ-মৎস্য-সবজি (থ্রি-এফভি)" মডেল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব **বান কি মুন**, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের প্রেসিডেন্ট **ড. হিলদা হেইন** এবং বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) **ড. ক্রিস্টালিনা জর্জিওভা** ২০১৯ সালের ১০ই জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপ্টেশন (জিসিএ) সম্মেলনে উপস্থাপিত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের যৌথ পরিচালনায় বন বিভাগ বাস্তবায়িত আইসিবিএএআর প্রকল্পের **বনজ-ফলদ-মৎস্য-সবজি (থ্রি-এফভি) মডেল** পরিদর্শন করেন।

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

মাহমুদ হাসান, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, আইসিবিএএআর ও অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
খুরশীদ আলম, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ, ইউএনডিপি বাংলাদেশ
মোঃ আব্দুল কাইয়ূম, হেড অব কমিউনিকেশন্স, ইউএনডিপি বাংলাদেশ

সম্পাদনা

আরিফ এম ফয়সল, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, ইউএনডিপি বাংলাদেশ
ড. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আইসিবিএএআর প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি বাংলাদেশ
কবীর হোসেন, কমিউনিকেশন্স অফিসার, আইসিবিএএআর প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি বাংলাদেশ

গ্রন্থনা

মারুফ হোসেন মিনার, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, চরফ্যাশন, ভোলা
ডা. পলাশ সরকার, পিএএ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, তজুমদ্দিন, ভোলা
সাজ্জাদ হোসেন তালুকদার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, তজুমদ্দিন ভোলা
ড. এস এম আতিকুল্লাহ, কনসালট্যান্ট
ওয়াহিদুজ্জামান সরকার, কনসালট্যান্ট
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি
মোঃ শফিকুল ইসলাম, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি
মোসাম্মাৎ শাহনীন মোশরেফা, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি
ড. মোঃ শফিকুর রহমান, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি
মোঃ কামরুজ্জামান কিরন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি
মোঃ মমিনুল ইসলাম, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি
মোঃ আবদুল কাইয়ুম, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি
মোঃ রফিকুল ইসলাম, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি
পল্টু পাল, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি

ছবি

ইমদাদুল ইসলাম বিটু, ঝন্টু চাকমা, অমিত কুমার ও আইসিবিএএআর প্রকল্প

ডিজাইন পরিকল্পনা ও পরামর্শ

কবীর হোসেন, কমিউনিকেশন্স অফিসার, আইসিবিএএআর, ইউএনডিপি বাংলাদেশ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

মোঃ জাহিদ হোসেন, শ্যাডো ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং

মুদ্রণ

শ্যাডো ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং
২৬৩, ফকিরাপুল, ঢাকা, ফোন: ০১৭৯৭ ৫৭৭২৫৭,
ই-মেইল: shadowbd.net@gmail.com

প্রকাশক

বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)
বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বন ভবন, কক্ষ নং-৩৩৩, ৩৩৫, লেবেল ২, আগারগাঁও, ঢাকা

প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০২০

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৮২৭৯-২

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আশা করা হচ্ছে, উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ (Bangladesh's economy is more at risk to climate change than any country).

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউএনডিপি উপকূলের টেকসই সবুজ বেষ্টনী নির্মাণ ও জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন নিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০০৯ সাল থেকে একান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন রকম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে আসছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, ইউএনডিপি ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে বন অধিদপ্তর কর্তৃক 'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বাধিক জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ৫টি জেলার (নোয়াখালী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর) ৮টি উপজেলায় ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় মতামত এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করে উপকূলের উপযোগী, জলবায়ু সহনশীল, অভিনব, প্রকৃতি ও প্রতিবেশভিত্তিক জীবিকায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে। এসব কার্যক্রম দেশে-বিদেশে আলোচিত ও প্রশংসিত হচ্ছে। এর ফলে প্রকল্প এলাকার মানুষদের জীবন-জীবিকার ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ ধরনের সফল কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হলে ভবিষ্যতেও বহু মানুষ উপকৃত হবে।

উক্ত প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত এ ধরনের জীবিকায়ন কার্যক্রমসমূহ সংকলনের উদ্যোগ নেওয়ায় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশ্বাস করি, উপকূলীয় জীবিকায়নে 'জলবায়ু সহনশীল ও প্রতিবেশভিত্তিক উপকূলীয় জীবিকায়ন' শীর্ষক প্রকাশনাটি জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভাব মোকাবিলায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি)
মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জলবায়ু ও পরিবেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, ব্যর্থতায় পৃথিবী জুড়ে বহু মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়বে। যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে হুমকির মুখে রয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশেষ করে, বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৯ জেলার সাড়ে তিন কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। উপকূলের বহু মানুষ প্রচলিত জীবিকা কার্যক্রম হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, ২০৫০ সাল নাগাদ উপকূলের ১০% এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে ও ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব প্রশমনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় টেকসই সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা ও উপকূলীয় জলবায়ু বিপন্ন মানুষের জীবিকায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। 'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)' প্রকল্পটিও মন্ত্রণালয়ের সে ধরনের একটি মহতি কর্মসূচির অংশবিশেষ; যেখানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বন অধিদপ্তর, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিসহ ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ও একটি এনজিও কাজ করছে।

টেকসই সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠায় বৈচিত্র্যময় বনায়নের পাশাপাশি প্রকল্পের জলবায়ু সহনশীল, প্রতিবেশভিত্তিক, বৈচিত্র্যময় অনেক কর্মকাণ্ড উপকূলীয় মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ কার্যক্রমগুলো সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় সম্প্রসারিত হলে জলবায়ু উদ্বাস্তু বহু মানুষ জীবিকায়নের উৎস খুঁজে পাবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

আমি উপকূলীয় জীবিকায়নে সময়োপযোগী 'জলবায়ু সহনশীল ও প্রতিবেশভিত্তিক উপকূলীয় জীবিকায়ন' প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(হাবিবুন নাহার, এমপি)
উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কোনো দায় না থাকলেও এ দেশের উপকূলীয় ১৯ জেলার সাড়ে তিন কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা, অসময়ে বৃষ্টিপাত, খরা, বন্যা ও নদীভাঙ্গনসহ নানা প্রতিবন্ধকতায় কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ বিভাগের জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডসমূহ স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে হাজার হাজার মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হিসেবে শহরমুখী হচ্ছে। এতে শহরের উপর মানুষের চাপ বেড়ে যাচ্ছে।

'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)' পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অভিযোজন প্রকল্প। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের অন্যান্য সহযোগী সংস্থাগুলো হলো সরকারের কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সাতটি বিভাগ, দপ্তর ও মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০২১ সময়কালে ৮৬০০ উপকূলীয় পরিবারে জলবায়ু সহনশীল ও অভিনব জীবিকায়নসহ টেকসই সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠায় ছয়শত বননির্ভর মানুষকে জীবিকায়নের আওতায় এনে বন পাহারায় সংযুক্ত করাসহ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) নেটওয়ার্কের ৬০০০ স্বেচ্ছাসেবীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষজ্ঞ মতামত, স্থানীয় চাহিদা ও অর্জিত জ্ঞানের আলোকে যে জলবায়ু সহনশীল ও অভিনব জীবিকায়ন কার্যক্রমসমূহ গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে তা ইতোমধ্যে উপকূলবাসীর নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতাও বৃদ্ধি হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে -যা এই প্রকল্পের অন্যতম উপজীব্য। সফল ও নন্দিত এ কার্যক্রমসমূহ অন্যত্র সম্প্রসারণযোগ্য।

আমি বিশ্বাস করি, প্রকল্প থেকে প্রকাশিত 'জলবায়ু সহনশীল ও প্রতিবেশভিত্তিক উপকূলীয় জীবিকায়ন' শীর্ষক প্রকাশনাটি ভবিষ্যতে উপকূলীয় এলাকায় গৃহীতব্য জলবায়ু সহনশীল যেকোনো জীবিকায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

০৬/১১/২০২০

জিয়াউল হাসান এনডিসি
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

‘বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলের পাঁচটি জেলার আটটি উপজেলার বন-নির্ভরশীল অনেক মানুষের ভাগ্যের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। উপকূলের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বননির্ভর জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বননির্ভরতা কমিয়ে তাদেরকে বন পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছে। উপকূলের এ সকল মানুষের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠে টেকসই সবুজ বেষ্টনী। প্রকল্পের আওতায় ১০৫০০ পরিবারের বৈচিত্র্যময় জীবিকায়নের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় কমপক্ষে পাঁচলাখ পরিবার উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পের এসকল অভিনব, জলবায়ু সহনশীল, প্রকৃতি ও প্রতিবেশভিত্তিক জীবিকায়নের সাফল্য উপকূলের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছে।

জলাবদ্ধতার কারণে যে জমি অনুর্বর ছিল বছরের পর বছর, সেখানে মাছ ও সবজি চাষ হচ্ছে। নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাগণ এ প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সুবিধার মাধ্যমে নদী, খাল বা উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ করে আয়ের সুযোগ পেয়েছে। লবণাক্ততার কারণে বস্তায় চাষ করা হচ্ছে শাকসবজি, ঘরে বসেই উৎপাদিত হচ্ছে গবাদিপশুর ঘাস। পুকুরে কোনো এক কোণে একটি খাঁচায় ফলানো হচ্ছে শাকসবজি ও ফলমূল, নেট লাগিয়ে করছেন মাছ চাষ। নারীরা করছেন হাঁস পালন ও ডিম উৎপাদন। ফলে যেসব মানুষ একদিন জলবায়ুর পীড়নে এলাকা ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে চলে গিয়েছিলেন দূর শহরে কাজের সন্ধানে, তারা আবার ফিরে এসেছেন। আইসিবিএএআর জীবিকায়ন কর্মসূচি তাদের দিয়েছে নতুন জীবন।

আমি মনে করি, উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সফলতার বিবরণ সংবলিত এই প্রকাশনার মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নে অর্জিত সাফল্য অন্যত্র সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

২.১২.২০২০

মাহমুদ হাসান
অতিরিক্ত সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, আইসিবিএএআর প্রকল্প

বাণী

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকোপ থেকে উপকূলের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষায় বিগত ছয় দশক ধরে বন অধিদপ্তর নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে প্রায় ২০০০০০ হেক্টর উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী যা দুর্যোগে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে উপকূলবাসীর জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা দিচ্ছে।

এই সবুজ বেষ্টনীকে আরও টেকসই করে গড়ে তুলতে ইউএনডিপি ২০০৯ সাল থেকে বন অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ৯০০০ হেক্টরের অধিক ম্যানগ্রোভসহ ৩০ সহস্র বননির্ভর পরিবারে জীবিকায়ন সহায়তা হয়েছে। আইসিবিএএর প্রকল্প ২০১৬ সাল থেকে বৈচিত্র্যময় ম্যানগ্রোভ সূচনাসহ বননির্ভর ১০,৫০০ পরিবারে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের ব্যবস্থা করেছে যাদের অর্ধেকের বেশিই নারী। এই জীবিকায়ন কর্মসূচির মূল লক্ষ্যই যাতে বননির্ভর জনগোষ্ঠী বনের ধ্বংস না করে বন পাহারায় অংশ নেয়। আমি এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ ও দাতা সংস্থা গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিসহ বাস্তবায়ন সহযোগী সকল সরকারি দপ্তর, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই।

আমি বিশেষ করে, এখানে বন বিভাগের বাস্তবায়িত প্রকল্পের বনজ-ফলদ-মৎস্য-সবজি (থ্রিএফভি) মডেলের কথা উল্লেখ করতে চাই। মডেলটি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত ও দেশ-বিদেশে বিপুল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ২০১৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপ্টেশন (জিসিএ) সম্মেলনে বাংলাদেশ বন বিভাগ প্রকল্পের থ্রি-এফভি মডেল উপস্থাপন করে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুনসহ বিশ্বনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ এ প্রকল্পের জন্য গর্বিত।

প্রকল্পের আওতায় ৬০০ বননির্ভর সদস্যকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে বন রক্ষা দল। এই সদস্যগণ বন পাহারা ও সুরক্ষায় বন বিভাগের কর্মীদের সাথে কাজ করছেন। আমি মনে করি, স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তা ও অংশগ্রহণ ছাড়া সবুজ বেষ্টনী টেকসই করা সম্ভব নয়। এ ধরনের সহায়তার জন্য আমি প্রকল্পের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রকল্পের জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডসমূহ উপকূলীয় প্রেক্ষাপট ও অভিযোজনের আলোকে গৃহীত হয়েছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির প্রয়োজনে এ ধরনের গ্রন্থের বিকল্প নেই। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ধন্যবাদ দিই।

মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বাণী

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূলতা মোকাবিলায় বাংলাদেশের অসংখ্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত। সে কারণে সাম্প্রতিক কালে বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা সুপারসাইক্লোনে প্রাণহানির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এ ধরনের কার্যকর পদক্ষেপে বাংলাদেশের একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন ফলপ্রসূ উদ্যোগের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীকে শক্তিশালী করা, সঠিক সময়ে দুর্যোগ বার্তা প্রচার, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কেন্দ্র নির্মাণ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটিকে কার্যকর করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব উপকূলের মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান। লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, বন্যা, খরা, অকাল বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রচলিত পেশাগুলো অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, আশ্রয়হীন মানুষ ক্রমশ বনজীবী হয়ে উঠেছে এবং এদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আইসিবিএএআর মূলত জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে কাজ করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলের মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও তাদেরকে লবণাক্ততা, বন্যা, জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহনশীল করে তোলা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলের ১০৫০০ পরিবারসহ এ পর্যন্ত ৩০ হাজার পরিবারে জলবায়ু সহনশীল জীবিকা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ফলে উপকূলীয় লাখো পরিবার উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা মোকাবিলায় ১৯৭০ সালের পর ভোলার মনপুরা ও চরফ্যাশনে যেসব স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়, তার সবগুলো সংস্কার করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে দুটি উপজেলায় ৫ লাখ পরিবার জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকোপ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

প্রকল্পটির আওতায় পরিচালিত জলবায়ু সহনশীল বিভিন্ন জীবিকায়ন কার্যক্রম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা, বিশেষজ্ঞ মতামত 'জলবায়ু সহনশীল ও প্রতিবেশভিত্তিক উপকূলীয় জীবিকায়ন' বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পের কার্যক্রম আরও প্রসারিত হবে। যার মধ্য দিয়ে উপকূলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, অভিযোজন ও জলবায়ুর ঝুঁকি কমানো সম্ভব বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। আমি প্রকল্পের বিভিন্ন সফল পদক্ষেপ বই আকারে প্রকাশ করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুদীপ্ত মুখার্জি
আবাসিক প্রতিনিধি
ইউএনডিপি বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পটভূমি.....১০
একনজরে আইসিবিএএআর প্রকল্প.....১৩
বনজ-ফলদ-মৎস্য ও সবজি (থ্রি-এফভি) মডেল.....১৫
সর্জন পদ্ধতিতে মাছ ও সবজি চাষ.....২৪
তিন স্তরে সবজি চাষ.....৩০
সমন্বিত মৎস্য, ফলদ, সবজি ও হাঁস পালন (টুএফভিডি) মডেল.....৩৬
ভাসমান সবজি চাষ.....৪৪
বস্তায় সবজি চাষ.....৪৯
ঝুলন্ত ও সিঁড়ি পদ্ধতিতে সবজি চাষ.....৫২
উফশী জাতের টি-আমন ধান চাষ.....৫৮
কেঁচো সার.....৬৪
খাঁচায় মাছ চাষ.....৭৪
বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ.....৮৪
কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ.....৯২
রুই জাতীয় মাছের নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনা..... ৯৮
খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালন.....১০৮
হাইড্রোফোনিক ঘাস.....১১৫
সাইলেজ.....১১৯
টার্কি পালন.....১২২
জলবায়ু সহনশীল মিশ্র প্রজাতির ফল ও ফসল.....১২৭
- খাটোজাতের নারিকেল.....১২৮
- পেয়ারা.....১৩২
- আপেলকুল.....১৩৬
- উচ্চ ফলনশীল মরিচ চাষ.....১৪০
- ড্রাগন ফল.....১৪৬
- সূর্যমুখী.....১৬০

প্রকল্পের কর্ম এলাকা.....১৬৬

পটভূমি

বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা ন্যূনতম হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের দিক থেকে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণজনিত ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আবহাওয়ার স্বাভাবিক চক্র ও ঋতু বৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঘটছে। ফলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে অধিক গরম বা শীত, অসময়ে বৃষ্টিপাত, গ্রীষ্মকাল দীর্ঘায়িত ও শীতকাল সংকুচিত হচ্ছে। হিমবাহ ও পর্বত চূড়ার জমাটকৃত বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (আইপিসিসি) আশঙ্কা করছে একুশ শতকের শেষ নাগাদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৮ ডিগ্রি থেকে ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রা ১.৮ ডিগ্রি থেকে ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশে উষ্ণ দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি (১৭-৩৯%) পাবে, মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, অতি স্বল্প সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.১৪ মিটার থেকে ০.৮৮ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এ কারণে দেশে অকাল বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে দেশের ১৮ ভাগ এলাকা (১ মিটার বৃদ্ধি) জলমগ্ন হতে পারে। এর প্রভাবে উপকূলীয় এলাকার ভূমিতে লবণাক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর এলেই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলের ১৯টি জেলার সাড়ে তিন কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, পৃথিবীতে ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে যত মানুষ মারা গেছে তার ৬০ ভাগই মারা গেছে বাংলাদেশে। ১৯৭০ সালের এক ঘূর্ণিঝড়েই মারা যায় ৫ লাখ মানুষ ও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১ লাখ ৩৮ হাজার মানুষ।

বর্তমানে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ ও পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা সম্প্রচারের কারণে জীবনহানি অনেক কমে গেলেও জীবিকায়নের ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকতর হচ্ছে। যেমন, ২০০৭ সালের সুপার সাইক্লোন সিডরে তিনহাজার মানুষ মারা গেলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বাংলাদেশের এক বছরের জাতীয় বাজেটের সমপরিমাণ। ২০০৯ সালের আইলা, ২০১৮ সালের মহাসেন ও ২০১৯ সালের ফণি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হওয়া সত্ত্বেও জীবনহানি অপেক্ষা জীবিকায়ন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিই বেশি হয়েছে।

তাছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশের মাধ্যমে স্বাদু পানি ও মাটিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ উপকূলের প্রধান পেশা কৃষি ও মৎস্যের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। জীবন-জীবিকা নির্বাহের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হওয়ার কারণে উপকূলীয় এলাকার মানুষ বসবাসের জন্য এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের ১০-১৫ ভাগ উপকূলীয় এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে ও ২ কোটি ৫০ লাখ বা ২৫ মিলিয়নেরও অধিক মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে।

ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেকে উপকূলীয় জীবন ও জীবিকার সুরক্ষায় শক্তিশালী সবুজ বেষ্টনীর বিকল্প নেই। তাই জাতীয় অভিযোজন কর্ম-পরিকল্পনা (নাপা) এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনায় (বিসিসিএসএপি) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলাকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী এসব ঘূর্ণিঝড়, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় বুক পেতে উপকূলীয় জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০৭ সালের সিডরের গতিবেগ ১৯৯১ সালের সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগের সমান হলেও সুন্দরবনের কারণে সিডরে মানুষের জীবনহানি অনেক কম হয়েছে । অনুরূপভাবে ২০১৯ সালের সাইক্লোন ফণি ও অতি সম্প্রতি বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আম্পান থেকেও উপকূলীয় মানুষের জান-মালের সুরক্ষা প্রদানে সুন্দরবন এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর ভূমিকা সর্বজনবিদিত।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) উপকূলীয় টেকসই সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহনশীল বৈচিত্র্যময় জীবিকায়নে বাস্তবায়ন করছে 'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)' প্রকল্প। গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) এর আর্থিক সহায়তায় বন অধিদপ্তর পরিচালিত এই প্রকল্পটি সরকারের সাতটি বিভাগ/দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেমন: বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ও একটি এনজিও। প্রকল্পটির মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছর ধরে জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৫টি উপকূলীয় জেলাধীন ৮টি উপজেলার ৮৬০০ বননির্ভর পরিবারে জলবায়ু সহনশীল, প্রতিবেশ ও প্রকৃতিভিত্তিক অভিনব এবং বৈচিত্র্যময় জীবিকায়ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে, যাদের অর্ধেকের বেশি নারীপ্রধান পরিবার।

প্রকল্পের এ ধরনের বৈচিত্র্যময়, প্রতিবেশ ও প্রকৃতিভিত্তিক, অভিনব এবং জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে গৃহীত হয়েছে। ফলে এগুলো যেমন বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহনশীল, উপকূলীয় প্রেক্ষাপটে মানানসই তেমনি এর উৎপাদন ক্ষমতাও বহুগুণ। তাছাড়া এধরনের কর্মসূচি যেমন আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী, তেমনি এর উপকরণও স্থানীয় পর্যায়ে সুলভ। ফলে প্রকল্পের এই জীবিকায়ন কর্মসূচিগুলো উপকূলের মানুষের জীবিকায়ন ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে। দেশ বিদেশের গণমাধ্যমে উঠে এসেছে এ ধরনের সফলতা ও অভিযোজন সক্ষমতার গল্প। জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলায় প্রকল্পের এসব সফল কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলে তা উপকূলের জীবিকায়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।

এই প্রকাশনায় প্রকল্পের সফল কার্যক্রমগুলোর পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা, বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উপকূলীয় জীবিকায়নে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা মোকাবিলায় এই প্রকাশনাটি যথেষ্ট সহায়ক হবে।

জলবায়ু সহনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক জীবিকায়ন বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে পরামর্শ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক সিনিয়র সচিব আব্দুল্লাহ-আল-মোহসীন চৌধুরী। মঞ্চে উপস্থিত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থপনা সচিব (প্রাক্তন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, আইসিবিএএআর) মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী (ডানে) ও মাঝে সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী

একনজরে আইসিবিএএআর প্রকল্প

ম্যানগ্রোভ বনায়নকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার অন্যতম মোক্ষম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস থেকে উপকূলীয় জীবন ও জীবিকার সুরক্ষায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বন অধিদপ্তরের সাথে গত এক দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সমন্বয়ে ইউএনডিপি ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ২০১৬ সাল থেকে সরকারের ৭টি দপ্তর/বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে 'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)' প্রকল্প। বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থাগুলো হলো-বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, ভূমি মন্ত্রণালয় ও একটি এনজিও। উপকূলের সর্বাধিক জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ পাঁচটি জেলার (নোয়াখালী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর) ৮ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পটির মূল লক্ষ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় টেকসই সবুজ বেষ্টনী নির্মাণ, জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন ও দুর্যোগের কবল থেকে জীবন ও সম্পদ সুরক্ষা করা।

প্রকল্পের মূল ক্ষেত্রসমূহ

- জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন ও উপকূলীয় বনায়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু সহনশীল প্রজাতি বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে টেকসই সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা।
- বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় কার্যকর পূর্বসতর্কতা অবলম্বন, প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

১০,৫০০ বননির্ভরশীল বিপন্ন পরিবারে জলবায়ু সহনশীল, অভিনব, প্রতিবেশভিত্তিক জীবিকার বন্দোবস্ত করা।
৬৫০ হেক্টর পরিত্যক্ত সবুজ বেষ্টনীতে বারো ধরনের জলবায়ু সহনশীল বৈচিত্র্যময় প্রজাতির ম্যানগ্রোভ বনায়ন।
৬০০ বননির্ভরশীল পরিবারকে সংগঠিত করে বনজ সম্পদ রক্ষা দল (এফআরপিজি) গঠন ও বন রক্ষায় সম্পৃক্তকরণ।
বন ব্যবস্থাপনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা।
দুর্যোগ মোকাবিলায় সিপিপির ৬০০০ স্বেচ্ছাসেবকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদান।
১৫,০০০ গবাদিপশুর দুর্যোগকালীন নিরাপত্তায় ৫ একর আয়তনবিশিষ্ট ৬টি উঁচু মাটির কিল্লা নির্মাণ।
এফআরপিজি'র কার্যক্রম পরিচালনা ও অভিযোজন তথ্যসেবা প্রদানে ১০ টি কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার ও আন্তর্জাতিক অ্যাডাপ্টেশন সেন্টারের সাথে সংযোগ সাধনে একটি স্যাটেলাইট অ্যাডাপ্টেশন লার্নিং সেন্টার স্থাপন।
জলাবদ্ধতা নিরসনে ২০টি স্লুইচগেট সংস্কারসহ ২.৯ কি.মি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভোলার মনপুরা ও চরফ্যাশনের প্রায় পাঁচ লাখ পরিবারের জীবিকায়নে সহায়তা প্রদান।

বনজ-ফলদ-মৎস্য ও সবজি (থ্রি-এফভি) মডেল

বনজ (Forest), ফলদ (Fruit), মৎস্য (Fish) ও সবজি (Vegetable) (থ্রি-এফভি) মডেল একটি প্রতিবেশভিত্তিক উদ্ভাবনীমূলক জীবিকায়ন যা সংক্ষেপে থ্রি-এফভি মডেল নামে পরিচিত। উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও জলবায়ু বিপন্ন মানুষের জলবায়ু ঝুঁকি প্রশমন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এই মডেলটি সূচিত হয়। বাংলাদেশের মতো একটি অধিক জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের উপকূলের জন্য আইসিবিএএআর প্রকল্পের আওতায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এই জীবিকায়ন মডেল জলবায়ু অভিযোজনে কার্যকর ভূমিকা রাখায় দেশ-বিদেশে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে মডেলটি টাইমস অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ২০১২ সালে 'আর্থ কেয়ার অ্যাওয়ার্ড' (Earth Care Award) ও ইউএসএ থেকে ২০১৩ সালে 'পিপল'স চয়েস অ্যাওয়ার্ড' (People's Choice Award) এ ভূষিত হয়।

উপকূলীয় বনের সন্নিকটস্থ চরের অনুর্বর, লবণাক্ত ও কম উৎপাদনশীল জমিতে থ্রিএফভি মডেল বাস্তবায়ন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মডেলটি অনুর্বর ও পরিত্যক্ত জমিকে উৎপাদনক্ষম, বনভূমির ধ্বংস রোধ ও বনকে অবৈধ দখলমুক্ত রাখতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)' প্রকল্পের আওতায় প্রতি হেক্টরে পাঁচটি পুকুর সদৃশ মডেল তৈরি করে বন বিভাগ কর্তৃক ভূমিহীন পাঁচজন উপকারভোগীর নামে একটি পুকুর (ডিচ) এবং পাড় (ডাইক) প্রথমে ১০ বছর ও পরে সফল পরিচালনার ওপর ভিত্তি করে আরও ১০ বছর ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়। এই মডেল থেকে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি বৈচিত্র্যময় পুনঃপুন ফসল, নানাবিধ সবজি ও মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে একজন উপকারভোগী বছরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জনসহ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক জীবিকা সহায়ক মডেলকে জলবায়ু পরিবর্তনের যেকোনো প্রত্যাশিত বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। মডেলটি উপকূলীয় জীববৈচিত্র্যতার ব্যবহার উপযোগী পানি, বাস্তুসংস্থান তৈরি এবং উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ বাস্তুতন্ত্র বৃদ্ধিতে সহায়ক।

থ্রি-এফভি মডেলটি বননির্ভরশীল ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়ন করা হয়। মডেলটি বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের আগ্রহ ও স্বেচ্ছাশ্রম একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালে প্রকল্পের আওতায় ২৮ হেক্টর পরিত্যক্ত বনভূমিতে ১৪০ টি থ্রি-এফভি মডেল (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় ১০০ টি এবং ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলায় ৪০ টি মডেল) বাস্তবায়ন করে ১৪০ জন ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে প্রদান করা হয়েছে, যাদের অর্ধেকের বেশি নারী উপকারভোগী। তবে বর্তমানে বনবিভাগের পরিত্যক্ত ভূমির স্বল্পতাহেতু উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আগ্রহের ভিত্তিতে বসতবাড়ির পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কারের মাধ্যমেও এই মডেলটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

থ্রি-এফভি মডেল বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

০১ যথাযথ জমি নির্বাচন

- সবচেয়ে উপযোগী স্থান হচ্ছে উপকূলীয় বন ও বেড়িবাঁধের মাঝখানের পরিত্যক্ত বনভূমি।
- জোয়ারে প্লাবিত হয় না নদী বা সাগর পাড়ের এমন পতিত জায়গা।
- লবণাক্ততার পরিমাণ কম আছে এ রকম জমি।

তবে এ মডেলটি উপকূলের বসতবাড়ির পরিত্যক্ত পুকুর বা যেকোনো অনুর্বর জমিতেই আকৃতি ছোট-বড় করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

০২ থ্রি-এফভি মডেলের নকশা

- ১ হেক্টর আয়তনের থ্রি-এফভি মডেলের জমিতে ৬ টি উঁচু ও প্রশস্ত পাড় (ডাইক: দৈর্ঘ্য: ২৫২ ফুট, প্রস্থ:৫৯ ফুট, উচ্চতা ৮ ফুট এবং ৫ টি পুকুর/ডিচ (দৈর্ঘ্য:১৮২ ফুট, প্রস্থ:৪৯.২ ফুট এবং গভীরতা ৮ ফুট করে খনন করা হয়।
- জমির সহজলভ্যতার ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে মডেলের পরিমাপ পরিবর্তন করা যেতে পারে।

০৩ ডিচ/পুকুর খনন

- আদর্শ মডেলের নকশা (ডিজাইন) অনুসরণ করে উপকারভোগী নিজেরা বা মাটি কাটার শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে বা খননযন্ত্র ব্যবহার করে খনন করতে পারে।
- পুকুরের চারদিকে ১.৫ মিটার বার্ম রেখে মডেলটি তৈরি করা হয়।

০৪ পাড়ের ভূমি প্রস্তুতি

- খনন কাজ শেষ হওয়ার পর পুকুরের পাড়ের উপরের পৃষ্ঠের মাটি সমান করা হয় এবং পাড়ের বাইরের ও ভিতরের ঢালগুলোর মাটি সমান ও মজবুত করা হয়।
- পাড়ের ভিতরের এবং বাইরের ঢালগুলোতে ঘাস রোপণ করা উচিত যাতে বর্ষা এবং জোয়ারের পানি দ্বারা মাটি ক্ষয় থেকে পাড়গুলো সুরক্ষিত থাকে।

থ্রি-এফভি মডেল বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

০৫ মাটি প্রস্তুতকরণ

- বর্ষার পানির সাথে পাড়ের মাটিতে বিদ্যমান লবণ দূর হয়ে যায় এবং স্থিতিশীল হয়। তখন প্রতিটি পাড়ে গাছ লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গর্ত খনন করা হয়।
- পাড়ের মাঝখানে বা উপরের পৃষ্ঠের উভয় প্রান্তে গর্ত খনন করা যেতে পারে।
- গর্তগুলোয় জৈব সার দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।
- সাধারণত ৯ফুট দূরত্বে একটি করে বনজ ও ফলদ গাছের চারা রোপণ করা হয়। এক সারি থেকে অপর সারির দূরত্ব হয় ৬ ফুট।
- দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির গাছগুলোর মধ্যে দূরত্ব আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

০৬ ফলদ, বনজ ও সবজি উৎপাদন

- উচ্চ ফলনশীল সবজি, ফলদ এবং বনজ প্রজাতির গাছের চারা সরবরাহ করা হয়।
- জলবায়ু সহনশীল ফসল উৎপাদন, রোপণ এবং সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- গাছের পাশাপাশি, পাড়ের উপরিভাগে প্রচুর পরিমাণে শাক্-সবজি চাষ করা।
- লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, দেশি শিম, করলা ইত্যাদি বর্ধনশীল জাতের সবজি উৎপাদনের জন্য মাচা পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- পুকুরের ভিতরের দিকে মাচা সম্প্রসারণ করে শাকসবজি উৎপাদন করা হয়। পুকুরের পানি শাকসবজি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

০৭ পুকুরের মাছ চাষ

- মৎস্য অধিদপ্তর পুকুর বা ডিচের পানিতে জলবায়ু সহনশীল ও অধিক উৎপাদনশীল মাছ চাষ ও পুকুর প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
- মাছের পোনা, খাবার, চুন, সার ইত্যাদি উপকরণ প্রদান।
- বৃষ্টির পানিতে পুকুরের পানি বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে চুন ও সার প্রয়োগ করে পুকুর প্রস্তুত করার পর বিভিন্ন প্রজাতির নির্দিষ্ট সংখ্যক মাছের পোনা পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

০৮ ফসল সংগ্রহ ও বিপণন

- পুকুরের পাড়ের উপরের অংশে ৬-৭ ধরনের শাকসবজির সাথে স্বল্পমেয়াদি ফসল এবং পাশাপাশি প্রতিটি পাড়ের প্রান্তে ক্রিপিং সবজি উৎপাদন বর্ধিত আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে।
- মাছ চাষ পদ্ধতি স্বল্পমেয়াদি থেকে মধ্যমেয়াদি আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে।
- দ্রুত বর্ধনশীল জলবায়ু সহনশীল ফলদ গাছগুলো রোপণের ১-২ বছরের মধ্যে নিয়মিত ফল উৎপন্ন করে। কিছু প্রজাতির কাঠ সরবরাহের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি আবার কিছু প্রজাতির বৃক্ষ দীর্ঘ সময় পর প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করে।

বন অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী নোয়াখালীর হাতিয়ায় থ্রি-এফভি মডেলের বনায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

থ্রি-এফভি মডেলের উৎপাদিত মৎস্য হাতে উৎফুল্ল উপকারভোগী মা ও মেয়ে

থ্রি-এফভি মডেলের কম্পোনেন্টসমূহ

বনায়নঃ থ্রি-এফভি মডেলের পুকুর পাড়ে ২০টি জলবায়ু সহিষ্ণু গাছ (মেহগনি, নিম, অর্জুন, ঝাউ, ইপিল ইপিল, তাল ও লম্বু) রোপণ করা হয়। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে থ্রি-এফভি মডেলের উপকারভোগীগণ দীর্ঘমেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ ও মধ্যমেয়াদের জন্য ডালপালা, জ্বালানি উপকরণ ও ফলমূল পায়। এ ছাড়াও থ্রি-এফভি মডেল জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সৃজিত বৃক্ষরাজি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও শক্তিশালী বাতাস) থেকে উপকারভোগীদের সুরক্ষা দেয়।

মৎস্য সম্পদঃ একটি পুকুরে বছরের দুই মৌসুমে বিভিন্ন প্রজাতির দ্রুত বর্ধনশীল জলবায়ু সহনশীল মাছ ছাড়াও স্বাদু পানির গলদা চাষ করা সম্ভব। থ্রি-এফভি মডেলে যেসব মাছ চাষ করা হয় তা হলো: মনোসেক্স তেলাপিয়া, রুই, কাতল, মৃগেল, গলদা, সরপুঁটি, গ্রাসকার্প এবং মিরর কার্প ইত্যাদি। পরিবারপ্রতি বছরে একটি মডেলে মাছ চাষ করে ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা উপার্জন সম্ভব।

পরিত্যক্ত বনভূমিতে থ্রি-এফভি মডেল

শাক-সবজি উৎপাদনঃ প্রত্যেক পরিবারের ৬ ফুট চওড়া একটি পাড়ে সারা বছর ধরে স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন ঋতুকালীন সবজি চাষ করার সুযোগ রয়েছে। পুকুরের পাড়ের মাটিতে লবণাক্ততা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকায় সবজি চাষের মাধ্যমে উপকূলীয় দরিদ্র পরিবারগুলো একদিকে যেমন নিজেদের খাদ্য সংকট নিরসন করতে পারছেন, তেমনি আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন। মাঠ জরিপে দেখা গেছে, পুকুরের পাড়ে সবজি চাষ করে এক একটি পরিবার বছরে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছে যা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারগুলোর স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও আইসিবিএএআর প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মাহমুদ হাসান (বাম থেকে দ্বিতীয়) থ্রি-এফভি মডেলের একজন উপকারভোগীর সাথে কথা বলছেন

ফলদ গাছঃ থ্রিএফ-ভি মডেলে পুকুরের পাড়ে ভিতরের দিকে ২০টি জলবায়ু সহিষ্ণু ফলদগাছ (আম্রপালি, সফেদা, বাউকুল, থাই পেয়ারা, মাল্টা, ছোট জাতের নারিকেল এবং ড্রাগন ফল) ও এর সাথে ৪০টি পেঁপে গাছ লাগানোর মাধ্যমে প্রতিটি মডেল থেকে বছরে স্বল্প ও মধ্যকালীন ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকার পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল উৎপাদন সম্ভব হয়। বিক্রির পাশাপাশি পরিবারের পুষ্টি চাহিদাও মেটানো যায়।

বসতবাড়ির পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে থ্রি-এফভি মডেল বাস্তবায়ন

উপর থেকে নেওয়া থ্রি-এফভি মডেলের দৃশ্য

থ্রি-এফভি মডেলের বৈশিষ্ট্য ও উপকারী দিক

এই মডেলের মাধ্যমে উপকূলের সম্মুখদিকে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ গাছ রোপণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সবুজ বেষ্টনী তৈরি হয়। এ সবুজ বেষ্টনী শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের তীব্রতা কমিয়ে আনে ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিরোধসহ বাফারজোন হিসেবে কাজ করে। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বাড়িঘর রক্ষার পাশাপাশি প্যারাবন বেষ্টনী, জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার উপযোগী পানি সরবরাহ, জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল সৃষ্টি এবং উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ প্রতিবেশ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

থ্রিএফ-ভি মডেলটি উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে গৃহীত হয়। এছাড়া প্রজাতি বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এই মডেল কার্বনের আধার হিসেবে কাজ করে। অনুর্বর উপকূলীয় এলাকা উর্বর ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ম্যানগ্রোভ বনের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা হ্রাস করে ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখে।

সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এই মডেলের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটে এবং স্থানীয় মানুষের জীবিকায়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতা তৈরি হয়। সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কারণে প্রকল্পের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত হয়। এটি ভবিষ্যতে ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক অ্যাডাপটেশনের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে যা বহু-মাত্রিক সুযোগ তৈরির মাধ্যমে উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার স্থায়িত্বশীল মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এটি বিদ্যমান প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা তৈরি করে থাকে।

থ্রি-এফভি মডেলটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর। এই মডেল বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থাগুলো হলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। এই চারটি সংস্থাই সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, উপকরণ বিতরণ এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

তথ্যসূত্র

- A New Land Use Model: Forest Fruit Fish : https://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/library/environment_energy/a-new-land-use-model--forest-fruit-fish.html
- Forest, Fish and Fruit Model or Triple F model : http://www.asiapacificadapt.net/adaptation-technologies/database/forest-fish-and-fruit-model-or-triple-f-model
- Fish-Fruit-Forest: An innovative Model to Adapt Coastal Communities: https://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/presscenter/pressreleases/2018/03/05/fish-fruit-forest-an-innovative-model-to-adapt-coastal-communit.htm

সর্জন পদ্ধতিতে মাছ ও সবজি চাষ

সর্জন পদ্ধতিতে মাছ ও সবজি চাষ

জমিতে নালা তৈরি করে তার পাড়ে শাকসবজি এবং নালায় বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করাকে সর্জন পদ্ধতিতে মাছ ও সবজি চাষ বা সর্জন কালচার বলা হয়। উপকূলীয় জলাবদ্ধ ও লবণাক্ত অনুৎপাদনশীল ভূমি সর্জন পদ্ধতির চাষাবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। লবণাক্ততার কারণে মানুষ তার কৃষি ফসলের উৎপাদন হারাচ্ছে এবং জলাবদ্ধতায় জমি ব্যবহার করতে পারছে না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এ ধরনের এলাকায় সর্জনে মাছ ও সবজি চাষ এক ধরনের প্রতিবেশভিত্তিক কার্যকরী সমাধান।

সর্জন কী

সর্জন শব্দটি মালয়েশিয়ান/ইন্দোনেশিয়ান শব্দ থেকে এসেছে। কোনো নির্দিষ্ট জমিতে এক বা একাধিক নালা তৈরি করে পাড় বেঁধে পাড়ে শাকসবজি, ফল এবং নালায় বিভিন্ন প্রকার মাছ চাষ করে অনুৎপাদনশীল/কম উৎপাদনশীল একই জমির বহুমুখী ব্যবহার করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় সারা বছর শাকসবজি ও মাছ চাষ করে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানো যায়। এটা বড় ও ছোট পরিসরে দুইভাবে করা যায়। গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবার যার অল্প একটু জমি আছে সে এই পদ্ধতিতে জমি ব্যবহার করে অধিক লাভবান হতে পারে। বিশেষ করে বৈরীভাবাপন্ন আবহাওয়া ও বিরূপ পরিবেশ এবং লবণযুক্ত মাটি বা উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য পদ্ধতিটি খুবই বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই। এটি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের জন্য খামারের ফলন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

সর্জন তৈরির সময়

নভেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সর্জন তৈরির উপযুক্ত সময় এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল চারা ও সবজি রোপণের উপযুক্ত সময়। সারা বছর সর্জনে কৃষিকাজ করা যায়।

পদ্ধতি

কোনো এক খণ্ড জমিতে ৪-৫ ফুট চওড়া ও ৫-৬ ফুট গভীর নালা তৈরি করে অনুরূপ আকারের পাড় বেঁধে সহজে এই সর্জনে তৈরি করা যায়। নালার পাড়ের মাটি ভালোভাবে লেভেলিং করে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির বীজ সময়মতো বপন করতে হয়। জাত নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে তা যেন লবণ সহনশীল হয়। শাকসবজি যেমন: লাউ, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, ধুন্দল, কলমি শাক, পুঁইশাক, করলা, মরিচ, টমেটো, ওলকপি, ডাঁটাশাক, বিট, ধনিয়া, বেগুন ইত্যাদি চাষ করা যায়। লতাজাতীয় সবজির জন্য মাচা তৈরি করে উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধি করা যায় এবং শুষ্ক মৌসুমে খাঁচা মাছের জন্য উপকারী ভূমিকা পালন করে। বর্ষায় যখন নালা পানিতে ভরে যায় তখন চাষকৃত মাছের পোনা ছেড়ে দিতে হবে। কই, পুঁটি, সিং, তেলাপিয়া, কার্পজাতীয় মাছ বেশি উপযোগী।

দলীয়ভাবে সর্জনে মাছ ও সবজি চাষ

গ্রুপভিত্তিক ও এককভাবে সর্জনে মাছ ও সবজি চাষ করা যায়। আইসিবিএএআর প্রকল্পে ২৫ জন উপকারভোগী একত্রে সর্জনে মাছ ও সবজি চাষ করে চরফ্যাশনে ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে। তাদের উৎপাদিত বিষমুক্ত সবজি এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। অথচ একসময় জলাবদ্ধতার কারণে বছরের নয় মাস কোনো ফসল হতো না। কিন্তু সর্জনে সবজি ও মাছ চাষ করায় এখন সেখানে সারা বছর নালায় মাছ চাষ ও উপরে সবজি চাষ হচ্ছে। মানুষের চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে সবুজে। ২৫টি পরিবারের দিনরাত্রির নিয়মিত বিষয় হয়ে উঠছে এই সর্জন। তারা কেউ কেউ নিজ বাড়ি রেখে সর্জন ক্ষেতে এসে ঘরও তুলেছে। এমনকি তাদের উৎপাদিত মাছ ও সবজি প্রদর্শনীর জন্য উঠেছে একটি পাকা স্থাপনাও। সামাজিকভাবেও তারা এখন শক্তিশালী।

সর্জন চাষির ফসল সংগ্রহ

ইউএনডিপির অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ জনাব খুরশীদ আলম (মাঝে) ও প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট আরিফ ফয়সলকে (ডানে) সর্জন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মারুফ হোসেন মিনার

দলীয়ভিত্তিক সর্জন চাষে আয়-ব্যয়

দলীয়ভাবে সর্জন চাষ অধিকতর লাভজনক। প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ভোলার চরফ্যাশনে ২৫ জন চাষি ১০ একর জমি লিজ নিয়ে মাছ ও সবজি চাষ করে এক বছরে ৭১,০১,০০০.০০ টাকা আয় করেছেন। উপকারভোগীদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে আয়-ব্যয়ের চিত্রটি নিম্নরূপ:

ব্যয়ের বিবরণ	টাকা
ক. জমি লিজ	
■ ১০ একর জমি এক বছরে লিজ নিতে ব্যয় হবে	১,২০,০০০.০০ টাকা
খ. সবজি চাষে ব্যয়	
■ ১০ একরে ২৫ প্যাকেট বীজ ক্রয় করতে খরচ হবে	৩২,৫০০.০০ টাকা
■ ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, বিআরডিসি ডেব সারে সর্বসাকুল্যে খরচ হবে	৮০,৫০০.০০ টাকা
গ. মাছ চাষে খরচ	
■ ১০ মণ মাছের পোনা ৮০০ টাকা দরে মোট খরচ	৮০,০০০.০০ টাকা
■ মাছের খাবার একরপ্রতি ৫ বস্তা হিসেবে ১০ একরে ৫০ বস্তার জন্য খরচ	৫৫,০০০.০০ টাকা
■ ২০০ কেজি চুন ক্রয়ে খরচ	৩,০০০.০০ টাকা
মোট খরচ:	**৩,৭১,০০০.০০ টাকা**

সর্জনের উপকারভোগীদের সাথে মৎস্য কর্মকর্তার মত বিনিময়

আয়ের বিবরণ

সবজি উৎপাদন: একরে ৫৭৬০ কেজি হিসাবে ৩০ টাকা দরে ১০ একরে = ৫৭৬০x৩০x১০=১৭,২৮,০০০.০০ টাকা
মাছ উৎপাদন: একরে ১৩০ কেজি হিসাবে ১৭০ টাকা দরে ১০ একরে = ১৩০x১৭০x১০ = ২,২১,০০০.০০ টাকা
মাছ ও সবজি থেকে ১ম ধাপে আয় (১৭,২৮,০০০.০০+২,২১,০০০.০০) = ১৯,৪৯,০০০.০০ টাকা।

প্রথম ৪ মাসে খরচ বাদে আয় হয়: (১৯,৪৯,০০০.০০-৩,৭১,০০০.০০) = ১৫,৭৮,০০০.০০ টাকা।
দ্বিতীয় ৪ মাসে খরচ বাদে আয় হবে প্রথম ৪ মাসের দেড় গুণ: ১৫,৭৮,০০০.০০x১.৫ = ২৩,৬৭,০০০.০০ টাকা।
তৃতীয় ৪ মাসে খরচ বাদে আয় হবে প্রথম ৪ মাসের দ্বিগুণ: ১৫,৭৮,০০০.০০x২ = ৩১,৫৬০০০.০০ টাকা।

সুতরাং বছরে ২৫ জনের এক বছরে সর্বমোট আয়: (১৫,৭৮,০০০+২৩,৬৭,০০০+৩১,৫৬০০০) = ৭১,০১,০০০.০০ টাকা।
খরচ বাদে জনপ্রতি বছরে সর্বমোট আয়: ৭১,০১,০০০.০০/২৫ = ২,৮৪,০৪০.০০ টাকা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ভূমিকা

লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা দুটিই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট। আর এই সমস্যার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে হাজার হাজার হেক্টর ভূমি ক্রমান্বয়ে চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। বছরে ৮-৯ মাস জলাবদ্ধ থাকায় ৩-৪ মাস চাষ হলেও কৃষকদের মাঝে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে কাঙ্খিত ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে সর্জনে সবজি ও মাছ চাষ পদ্ধতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ এই পদ্ধতিতে সারা বছর ফসল উৎপাদন ও মাছ চাষ করা সম্ভব। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব। যেকোনো দরিদ্র কৃষক পরিবার এই পদ্ধতিতে তার জীবিকায়নে বিকল্প তৈরি করতে পারেন।

উপসংহার

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় এই পদ্ধতিতে মাছ ও সবজি চাষ করা বেশ ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় এর চাষ পদ্ধতি ব্যাপক সম্প্রসারণ হচ্ছে। তবে দরিদ্র পরিবারে প্রকল্প সহায়তা পেলে সর্জনে মাছ চাষ পদ্ধতি অধিক হারে জনপ্রিয়তা পাবে। সর্জনে মাছ ও সবজি চাষ জলবায়ুজনিত প্রভাব মোকাবিলায় উপকূলীয় অঞ্চলে একটি পরীক্ষিত ও কার্যকর অভিযোজন পদ্ধতি।

বিপণনের জন্য প্রস্তুতি

তিন স্তরের সবজি চাষ

তিন স্তরে সবজি চাষ

তিন স্তরে সবজি চাষ একটি অভিনব পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে একই জমিতে একই সময় তিন স্তরে শাক-সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। পদ্ধতিটি উপকূলীয় ভূমিহীন, দরিদ্র ও জলবায়ু উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী যাদের সবজি উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার স্বল্পতা রয়েছে তাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। তিন স্তরের সবজি চাষের মাধ্যমে সারাবছর একখণ্ড জমি থেকে তিনগুণ ফসল পাওয়া যায়। ফলে উপকূলে বেড়িবাঁধ, সরকারি আশ্রয় ও জলবায়ু উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী বা যাদের জমির স্বল্পতা রয়েছে তারা এ পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে অধিক লাভবান হতে পারেন। সবচেয়ে বড় বিষয় নারীদের মাধ্যমেই এর ব্যবস্থাপনা সহজ।

বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির শতকরা প্রায় ৫ ভাগ বসতবাড়ি। বসতবাড়ির এ জমিতে কৃষকগণ প্রায়শই অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফলমূলের চাষ করে থাকেন। চাষকার্যে ফসলের উন্নত জাত বা মানসম্পন্ন বীজও ব্যবহার করা হয় না। বসতবাড়ির এ জমিতে বছরব্যাপী পরিকল্পিতভাবে উন্নত জাত ও মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে শাকসবজি, ফল-মূল, মসলা ইত্যাদি ফসল চাষ করে যেমন পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটানো যায় তেমনি আর্থিকভাবেও প্রচুর লাভবান হওয়া যায়।

আইসিবিএএআর প্রকল্প বসতবাড়ির আঙিনায় উন্নত জাত ও মানের শাকসবজি আবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেশভিত্তিক প্রযুক্তির পরিচয় ঘটিয়েছে, যা হচ্ছে তিন স্তরবিশিষ্ট সবজি চাষ।

উপকূলীয় এলাকার প্রেক্ষাপটে তিন স্তরবিশিষ্ট সবজি চাষের উপযোগিতা

- উপকূলীয় এলাকার অধিকাংশ কৃষি জমি নিচু যা জোয়ার/বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হয় এবং সবজি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে অনুৎপাদনশীল/কম উৎপাদনশীল জমির বহুমুখী উৎপাদনক্ষম করা সম্ভব।
- সকল প্রকার অনুপরিবেশে বিজ্ঞানভিত্তিক স্তরবিশিষ্ট আবাদ প্রক্রিয়ায় বর্ষব্যাপী শাক-সবজি চাষ করা যেতে পারে।
- বসতবাড়ির বিদ্যমান সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং একই জমি থেকে সারা বছরের চাহিদা পূরণ করা যায়।
- শাক-সবজির বাগান বসতবাড়ির পরিবৃত্তে স্থাপিত স্তরবিশিষ্ট হওয়ার কারণে পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল কাজের সুবিধা হয়।
- বসতবাড়ির বিদ্যমান সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং একই জমি হতে সারা বছরের চাহিদা পূরণ করা যায়।

তিন স্তরের শাক-সবজি আবাদের সুবিধা

- অল্পপরিমাণ জমিতে পরিকল্পিত উপায়ে নানাবিধ শাক-সবজি আবাদ করা যায়।
- পরিবারের চাহিদামতো সবজি উৎপাদন করা যায়।
- উৎপাদিত টাটকা এবং বিষমুক্ত ও নিরাপদ শাক-সবজি থেকে অধিক পুষ্টির যোগান পাওয়া যায়। ফলে পুষ্টি ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে না।
- বসতবাড়ির উচ্ছিষ্ট দ্বারা জৈব সার প্রস্তুত করে জৈব কৃষি উৎসাহিত করা যায়।
- পরিবারের নারী সদস্যদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- পরিবারের চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন বাজারজাত করে বাড়তি আয়ের সংস্থান হয়।
- বসতবাড়িতে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং একই জমি থেকে সারাবছরের শাক-সবজির চাহিদা পূরণ করা যায়।

তিন স্তরের শাক-সবজি চাষে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- একটি বসতবাড়িতে নানা ধরনের ইকোসিস্টেম বা অনুপরিবেশ থাকতে পারে, যেমন: উঁচু জমি, মাঝারি উঁচু জমি, নিচু জমি, কম ছায়াযুক্ত জমি, উন্মুক্ত, অধিক গাছ-পালায় আচ্ছন্ন জমি ইত্যাদি। সাধারণত উন্মুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল জমিই শাক-সবজি চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।
- অধিকাংশ বসতবাড়ির রৌদ্রোজ্জ্বল অংশ সীমিত হয়ে আসছে সেহেতু অন্য কোনো অনুপরিবেশে শাক-সবজি আবাদে গুরুত্ব দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।
- কতকগুলো অনুপরিবেশ শুধু বিশেষ কিছু শাক-সবজি চাষের উপযোগী তাই বসতবাড়ির অনুপরিবেশ উপযোগী শাক-সবজির জাত নির্বাচনে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন: তিন স্তরবিশিষ্ট শাক-সবজি আবাদের ক্ষেত্রে মাচার উপরে পুঁইশাক নিচে আদা বা অন্য কোনো ছায়া সহনশীল ফসলচাষ করা যেতে পারে।
- সর্বোপরি বসতবাড়িতে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং একই জমি থেকে সারা বছরের শাক-সবজি উৎপাদন।

উপকারভোগীদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ প্রদান

উপকরণ

উপযোগী উঁচু/মাঝারি উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না। প্রয়োজনীয় বাঁশ বা কাঠের খুঁটি, জাল, রশি, নেট, বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ, জৈব সার/ভার্মি কম্পোস্ট, সেক্সফোরামেন।

আয়-ব্যয়

পদ্ধতিটি ৩ শতক জমিতে বাস্তবায়নে আনুমানিক খরচ হয় প্রায় ৫,০০০.০০ টাকা। এর মাধ্যমে একটি পরিবার বছরে কমপক্ষে ২৫-৩০ হাজার টাকার সবজি উৎপাদন করতে সক্ষম। প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে কোনো উপকারভোগী বছরে ৮০-৯০ হাজার টাকাও উপার্জন করে থাকেন।

স্তর উপযোগী শাক-সবজি

স্তরের নাম	উপযোগী শাক-সবজি
১ম স্তর	কলমি শাক, পুঁইশাক, ডাঁটা শাক, লাল শাক, পালং শাক, ধনিয়া, মুলা ইত্যাদি
২য় স্তর	লতা জাতীয় সবজি, যেমন: শসা, করলা, ধুন্দল, বরবটি, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি
৩য় স্তর	লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া ইত্যাদি

প্রত্যাশিত ফলাফল

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনুৎপাদনশীল/কম উৎপাদনশীল জমির বহুবিধ উৎপাদনশীলকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। বসতবাড়িতে উপযুক্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তি জ্ঞান, পদ্ধতি ও দক্ষতার অভাবে অনেকে শাক-সবজি চাষ করতে পারে না। তিন স্তরের শাক-সবজি চাষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা, আপদকালীন খাদ্য এবং আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

টুএফভিডি মডেল

সমন্বিত মৎস্য, ফলদ, সবজি ও হাঁস পালন (টুএফভিডি মডেল)

সমন্বিত পদ্ধতিতে মৎস্য, ফলদ, সবজি চাষ ও হাঁস পালন একটি প্রতিবেশভিত্তিক জলবায়ু সহনশীল উদ্ভাবনীমূলক জীবিকায়ন মডেল। এই মডেলের মাধ্যমে পুকুর, স্রোতবিহীন নদী ও খালে একই সাথে মাছ, শাকসবজি, ফল চাষ এবং হাঁস পালন করে উপকূলের জলবায়ু বিপন্ন জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে যেমন লাভবান হচ্ছেন তেমনি পারিবারিক পুষ্টি চাহিদাও মেটাতে পারছেন। উপকূলীয় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা হ্রাসে একমুখী জীবিকায়ন সহায়তায় বিপদাপন্নতা হ্রাস কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সম্ভব না হওয়ায় উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও বাস্তবতা বিবেচনা করে মৎস্য, কৃষি এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রযুক্তিগত সহায়তায় প্রকল্প কর্তৃক এই মডেলটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই প্রযুক্তিতে খাঁচা বানিয়ে সারা বছরই পর্যায়ক্রমে মাল্টা, কুমড়ো, লাউ, করলা, বেগুন, মরিচ, বরবটি ইত্যাদি উৎপাদন সম্ভব। বিশেষ করে, খাঁচার ফ্রেমের সাথে জাল বা নেটে যে মাছ চাষ করা হয় তা বছরে তিনবার বিক্রির উপযোগী হয়। পুকুরে মাছ চাষ করলে তা ঠিকভাবে খাবার পায় না। বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে ভেসে যেতে পারে। সাপে খেয়ে ফেলতে পারে ও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু এই মডেলে চাষ করলে জালে যতগুলো মাছ ছাড়া হবে ততগুলো মাছই বড় হওয়ার সুযোগ পাবে। তাই মাছচাষিরা অধিকতর লাভবান হবেন। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা হলে জালের ভেতরে থাকায় কোনো মাছ বের হয়ে যাবে না। বন্যার সময় পানি যত বাড়বে খাঁচার সাথে জালও তত উপরে উঠবে। আবার রৌদ্রে শাকসবজির ক্ষতি এড়াতে ফ্রেমটি পুকুরের এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরিয়ে নেওয়া যাবে। যেহেতু স্থানীয় উপকরণ দিয়েই এর ফ্রেম বানানো যায়, তাই এর উৎপাদন খরচও বেশি পড়ে না।

খাঁচা প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে পরিবারের পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে 'ইন্টিগ্রেটেড ফ্লোটিং কেজ অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম (ইফকাস)' প্রযুক্তিতে পুকুরে একত্রে মাছ ও শাক-সবজি সমন্বিত চাষ করে সম্প্রতি সফলতা পেয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) গবেষকগণও। বাকৃবির মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক এই সফল ইফকাস প্রযুক্তিটির উদ্ভাবক।

আইসিবিএএআর প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে ভাসমান পদ্ধতিতে এ ধরনের শাক-সবজি, মাছ চাষ ও হাঁস পালন বিভিন্নভাবে করা যায়। যেমন: পুকুরে, খালে ও নদীতে। তবে পুকুরে রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর।

পুকুরে ভাসমান শাক-সবজি, মাছ চাষ ও হাঁস পালনের বিবরণ

উপকরণ: ভাসমান আয়তক্ষেত্র আকৃতির খাঁচা তৈরির প্রধান উপকরণ হচ্ছে: বাঁশ-৮-১০টি, রশি পরিমাণমতো, জাল/নেট- পরিমাণমতো, বড় ড্রাম-৯-১০ টি, ফলের প্লাস্টিকের ঝুড়ি-১৬টি, মাটি-পরিমাণমতো, জৈব সার-পরিমাণমতো, বীজ- পরিমাণমতো, মাছের পোনা-৬০০-৮০০টি, হাঁসের ঘর-১টি, হাঁস-১০টি।

খাঁচার আকার: প্রতিটি খাঁচার দৈর্ঘ্য-২২ ফুট, প্রস্থ-২০ ফুট ও উচ্চতা-৬ ফুট।

ভাসমান ফসল চাষের সময়কাল: যেসব এলাকা সারা বছর বা বছরের কিছু সময়ে জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে সেসব স্থানে আয়তক্ষেত্র আকৃতির ভাসমান খাঁচায় গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন বা সারা বছর উৎপাদিত হয় এমন শাকসবজি উৎপাদন করা যায়।

ভাসমান খাঁচা তৈরির পদ্ধতি: বাঁশ দিয়ে তৈরি ভাসমান খাঁচাকে ভাসিয়ে রাখার জন্য কাঠামোটির চার পাশে ফলের ঝুড়ি ও বড় প্লাস্টিকের ড্রাম বসানোর জন্য ৯টি খাঁজ রাখা হয়। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্লাস্টিকের ২০০ লিটারের ড্রাম ভাসমান খাঁচাকে ভাসিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। বাঁশের ফ্রেমের অনুপ্রস্থ বরাবর দু'টি ফোটের মাঝে সবজি রোপণের জন্য একটি করে মাচা তৈরি করা হয় এবং প্লাস্টিকের ঝুড়ি বসিয়ে সেখানে পুকুরের শুকনো কাদা, গোবর ও অন্যান্য জৈবসার মিশিয়ে দেওয়া হয়। মাচার নিম্নাংশে পুকুরের পানিতে লেগে থাকার কারণে পানি থেকে উদ্ভিদ সহজে সারবস্তু গ্রহণ করতে পারে। এতে করে উদ্ভিদের জন্য কোনো সেচের প্রয়োজন হয় না। কাঠামোর উপরিতলের গঠন বরাবর সবজি গাছ বেয়ে চলার জন্য চিকন বাঁশের টুকরো দিয়ে একটি মাচা তৈরি করা হয়।

চাষিদের পছন্দ অনুযায়ী লতানো সবজি এবং পুকুরের পানি থেকে পুষ্টি শোষণ করতে পারবে এ রকম জাতের সবজি মাচায় রোপণ করা যায়। খাঁচার জালের ভেতর মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা ১০০ ঘনমিটার হারে মজুদ করে ভাসমান খাদ্য প্রয়োগ করে চাষ করা যায়। ইচ্ছে হলে রুই কাতলা বা মিশ্র কার্প চাষও করা যায়। চাষিরা তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী সবজি যেমন: শসা, চিচিঙ্গা, পুঁইশাক, করলা ও শিম ইত্যাদি লতানো সবজি হিসেবে রোপণ করতে পারবেন। এই মাধ্যম বিশেষভাবে নারীদের উপযোগী। তারা যখন তখন নেট থেকে মাছ সংগ্রহ বা সবজি তুলতে পারেন।

আধা ছায়াময় ও গভীর-ছায়াময় পুকুরের ভাসমান খাঁচায় তেলাপিয়ার উৎপাদন যথাক্রমে ৮০ থেকে ১০০ কেজি হয়। গভীর ছায়াময় পুকুরের ভাসমান খাঁচায় হাঁস, ডিম, তেলাপিয়ার উৎপাদন কম হওয়ার সম্ভাব্য কারণ পুকুরের পানিতে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রাইটের উপস্থিতি, যা পুকুরে গাছের পাতা ও অন্যান্য জৈব অংশ পচে তৈরি হয়।

দরিদ্র কৃষকদের জন্য এই অ্যাকোয়াকালচার সম্পর্কিত প্রযুক্তিটিতে ইতোমধ্যে অনেক সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং জলবায়ু বিপন্ন পরিবার উৎসাহিত হয়েছেন। শুধু ছায়াময় পুকুরের জন্যই নয়; বরং বহুমালিকানা পুকুর, বিল, খাল, নদী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধ এলাকা ইত্যাদিতে ব্যবহার করলে কৃষকেরা পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি উৎপাদিত মাছ, হাঁস, ডিম ও সবজি বিক্রি করে লাভবান হতে পারবেন। পুকুরে ভাসমান পদ্ধতিতে হাঁস পালন, মাছ ও সবজি চাষ সারা বছরই করা যায়। এটি ভেসে যাওয়ার কোনো ভয় থাকে না।

লাভ বিশ্লেষণ

খরচঃ টুএফভিডি প্রযুক্তির ফ্রেম তৈরি করতে খরচ হবে বাঁশ, জাল, ঝুড়ি, রশি ইত্যাদিসহ ৩০,০০০.০০ টাকা থেকে ৩৫,০০০.০০ টাকা। তবে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করলে এই খরচ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া টুএফভিডি'র উপকরণসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে সহজেই পাওয়া যায়।

মাছ চাষঃ এই প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করলে কৃষক খুব অল্প সময়ে (প্রথমদিকে ৯০ দিন এবং পরবর্তীতে মাত্র ৩০ দিন) পর পর মাছ বিক্রি করতে পারবেন। জলাশয়ে ভাসমান পদ্ধতিতে মাছ চাষে কৃষকের এককালীন মাছের পোনা, মাছের খাবার, রাসেল নেট ইত্যাদি মিলিয়ে খরচ হয় মাত্র ১০,০০০.০০ টাকা এবং উক্ত খরচে অর্ধছায়াযুক্ত ও পূর্ণছায়াযুক্ত পুকুরে ভাসমান পদ্ধতিতে ৯০ দিনে ১২০ কেজি তেলাপিয়া উৎপাদন করতে পারবেন, যার বাজারমূল্য প্রায় ১২,০০০.০০ টাকা। এভাবে বছরে কমপক্ষে তিনবার মাছ চাষ করে ৩৫,০০০.০০ থেকে ৩৬,০০০.০০ টাকা আয় করতে পারবেন। একই কাঠামোতে একাধারে ৫ বছর ধরে মাছের চাষ করা যাবে।

সবজি চাষ: একজন কৃষক খুব অল্প সময়ে (প্রথমদিকে ৪০-৫০ দিন এবং পরবর্তীতে মাত্র ৩০ দিন) পর শাক-সবজি উৎপাদন করতে পারবে। ভাসমান সবজি চাষে এককালীন কৃষকের খরচ হয় মাত্র ৪,০০০.০০ টাকা (বাঁশ, রশি, নেট, প্লাস্টিকের ঝুড়ি, মাটি, জৈব সার, বীজ ইত্যাদি) এবং উক্ত খরচে তিন মাস পর থেকে পারিবারিক খাবার চাহিদা মিটিয়ে প্রতিমাসে কমপক্ষে ১,৫০০.০০-২,০০০.০০ টাকা আয় করতে পারবেন। পুকুরে ভাসমান সবজি চাষ সারা বছরই করা যায়। ফলে একবার খরচ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে একজন কৃষক বছরে ২০,০০০.০০ টাকা লাভ করতে পারেন।

ফল চাষ: একজন কৃষক খুব অল্প খরচে ছয় মাস পর ফল উৎপাদন করতে পারবে। খালে বা খোলা জলাশয়ে ভাসমান ফল চাষে কৃষকের খরচ হয় মাত্র ১,০০০.০০-১,৫০০.০০ টাকা এবং উক্ত খরচে তার ফল উৎপাদন হবে কমপক্ষে ৩,০০০.০০-৫,০০০.০০ টাকা। একই খাঁচায় পর্যায়ক্রমে ৫ বছর ফল উৎপাদন করা যায়। খাঁচা তৈরির জন্য একবার খরচ করে সারা বছরই পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে আরও বাড়তি আয় করা যায়। দ্বিতীয় বছর থেকে গড়ে ফল চাষে কৃষকের বছরে কম করে হলেও ৫,০০০.০০-৬,০০০.০০ টাকা লাভ হবে।

হাঁস পালন: জলাশয়ে ভাসমান পদ্ধতিতে হাঁস পালনে কৃষকের খরচ হয় ১০টি হাঁসসহ মাত্র ১০,০০০.০০ টাকা। উক্ত খরচ কমিয়ে আনা যায় যদি কৃষক নিজের ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে কাঠামো তৈরি করে ও ঘরোয়া খাবার প্রদান করে। উক্ত খরচে হাঁস পালন করলে প্রতিটি হাঁস থেকে বছরে সর্বোচ্চ ২৭০ থেকে ২৮০ টি ডিম উৎপাদন করে থাকে। যার বাজারমূল্য প্রায় ২,৭০০.০০-২,৮০০.০০ টাকা। ফলে ১০টি হাঁস থেকে সারা বছরই পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে একজন কৃষক ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করতে পারবেন।

ভাসমান পদ্ধতির সুবিধা

- স্থায়ী জলাবদ্ধ এলাকায় (খাল, পুকুর, হাওরা বা হ্রদ) সারা বছর এ পদ্ধতিতে ফল, মাছ ও সবজি চাষ এবং হাঁস পালন করা যায়।
- পরিবেশবান্ধব ও জৈব পদ্ধতিতে ফসল আবাদ করা যায়।
- চাষের খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম।
- সেচের প্রয়োজন পড়ে না।
- খুব কম সার ও বালাইনাশক ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করা যায়।
- পল্লির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও সহজেই পুষ্টির যোগান বাড়ানো যায়।
- দরিদ্র চাষিদের আয় বাড়ে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টি ও মৌসুমি বন্যায় ফসলের কোনো ক্ষতি করে না।
- পারিবারিক শ্রমের সদ্ব্যবহার হয়।
- একই জমিতে পরিকল্পিতভাবে ফল, শাক-সবজি ও মাছ উৎপাদন করা যায়।

ভাসমান পদ্ধতিতে কিছু অসুবিধার কথা মাথায় রাখা ভালো। খুব বেশি স্রোত ও গভীর পানিতে না করাই ভালো। ইঁদুর, জোঁকের আক্রমণ ও দুর্গন্ধের সৃষ্টি যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র

IFCAS (Integrated Floating Cage Aquageoponics System) in Bangladesh and Nepalhttps://www.youtube.com/watch?v=LzA05QfZYCs YouTube Video, Access on 16 September 2014

প্রকল্প ব্যবস্থাপকের টুএফভিডি মডেল পরিদর্শন

AFC
AFC
AFC

টুএফভিডি মডেলে কর্মরত মা ও মেয়ে

ভাসমান সবজি চাষ

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে শাকসবজি চাষও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়াসহ জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অন্যদিকে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাওয়া ও সবজি উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। ফলে বিকল্প উপায়ে শাকসবজি উৎপাদনের কৌশল নিয়ে এখনই ভাবতে হচ্ছে। ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ এ ধরনের একটি উদ্যোগ। আইসিবিএএআর প্রকল্প দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসমূহে এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করায় প্রকল্পের উপকারভোগী ও সাধারণ মানুষের মাঝে এ বিষয়ে ইতিবাচক আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে।

ভাসমান সবজি চাষের গোড়াপত্তন পূর্ব চীনের জিয়াংসু প্রদেশের তাইহতে। সেখানে শাকসবজি, তরমুজ ও দানাজাতীয় প্রায় ৩০ ধরনের শস্য আবাদ করে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। চীনে ভাসমান খামারে সবজি উৎপাদন দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আবাদযোগ্য জমির একটা উল্লেখযোগ্য অংশে ৩-৬ মাস নানা প্রাকৃতিক কারণে প্লাবিত বা অর্ধপ্লাবিত থাকে। এছাড়া নদী, খাল, বিল ও পুকুর ইত্যাদিও প্লাবিত হয়ে থাকে। এখানকার খামারিরাও ভাসমান ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয় ব্যবহার করছেন।

যেসব এলাকায় ভাসমান ধাপে ফসল উৎপাদন করা যায় সে এলাকাগুলো হলো: বরিশাল, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, গাইবান্ধা, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি। এছাড়াও মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ জেলার বন্যাপ্রবণ নিম্ন এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি আবাদ করা যায়।

ভাসমান পদ্ধতিতে পানির উপর বেড এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোকের সাহায্যে ফলের ঝুড়িতে শাকসবজি চাষে পারিবারিক চাহিদা পূরণ করে অধিকতর লাভবান হওয়া যায়। বন্যার সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে কাজ থাকে না। মানুষ বেকার জীবনযাপন করে। এখানে সবজি আবাদের প্রতি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে এলাকায় পুষ্টির সমস্যা প্রবল। এসব সমস্যা নিরসনে উপকূলবাসী নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে উদ্ভাবন করেছেন ভাসমান সবজি চাষের পদ্ধতি। পুকুরে বাঁশের তৈরি ভাসমান ত্রিভুজ আকৃতির খাঁচায় প্লাস্টিকের ফলের ঝুড়িতে মাটি ও জৈব সার প্রয়োগ করে সবজি চাষ করছে, যা পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটায় এবং আপদকালীন বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও নষ্ট হয় না।

ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ বিভিন্নভাবে করা যায়। যেমন : পুকুরে ভাসমান সবজি চাষ, খালে ভাসমান সবজি চাষ, নদীতে ভাসমান সবজি চাষ ইত্যাদি।

উপকারভোগির ফসল পরিচর্যা

ভাসমান চাষ পদ্ধতির সুবিধা

- উপকূলীয় এলাকা বা বন্যা ও জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান ধাপে সবজি চাষ একটি লাগসই প্রযুক্তি।
- পুকুরে ভাসমান সবজি চাষ সারা বছরই করা যায়। এটি ভেসে যাওয়ার কোনো ভয় থাকে না।
- নারীবান্ধব প্রযুক্তি।
- সারা বছর এ পদ্ধতিতে সবজি চাষ করা যায়।
- পরিবেশবান্ধব ও জৈব পদ্ধতিতে ফসল আবাদ করা যায়।
- চাষের খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম।
- সেচের প্রয়োজন পড়ে না।
- খুব কম সার ও বালাইনাশক ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করা যায়।
- পল্লির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও সহজেই পুষ্টির যোগান বাড়ানো যায়।
- দরিদ্র চাষিদের আয় বাড়ে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টি ও মৌসুমি বন্যায় ফসলের কোনো ক্ষতি করে না।
- জলাবদ্ধ এলাকার জলজ আগাছা ও কচুরিপানার সদ্ব্যবহার হয়।
- পারিবারিক শ্রমের সদ্ব্যবহার হয়।
- পুকুরে ভাসমান সবজি চাষ ছাড়াও খালে ও নদীতেও ভাসমান সবজি চাষ করা যায়।

লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ

একজন কৃষক খুব অল্প সময়ে (প্রথম দিকে ৪০-৫০ দিন এবং পরবর্তীতে মাত্র ৩০ দিন পর) শাক-সবজি উৎপাদন করতে পারবেন।

পুকুরে ভাসমান সবজি চাষে কৃষকের খাঁচা তৈরিতে এককালীন খরচ হবে সর্বোচ্চ ৬০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা। তবে ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে কাঠামো তৈরি করলে এই খরচ ৬০০০ টাকায় সীমাবদ্ধ রাখা যায়। এরপর শুধু কৃষিবীজ ও সার সংগ্রহের জন্য আরও ১৫০০-২০০০ টাকা খরচ হবে। এর মাধ্যমে একজন কৃষক তার দৈনন্দিন শাক-সবজির চাহিদা পূরণ করে বছরে কমপক্ষে ১৫,০০০-২০,০০০ টাকা আয় করতে পারবেন। দ্বিতীয় বছর থেকে পর্যায়ক্রমে এ লাভ বাড়তে থাকবে।

সবচেয়ে বড় কথা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলের শাক-সব্জির চাষ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে, নারী ও শিশুরা দারুণভাবে পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ করে জলবায়ুর প্রভাবজনিত পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব।

পুকুরে ভাসমান সবজি চাষের উপকরণ ও সম্ভাব্য খরচ নিচে দেওয়া হলো

ভাসমান সবজি বাগান

কার্যক্রম শুরুর সময়ঃ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

বিবরণ	বিস্তারিত	পরিমাণ	একক	একক মূল্য টাকা (বাজারদর)	মোট মূল্য টাকা
গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ: পুঁইশাক / লাউ/ করলা / চিচিঙ্গা / ঝিঙ্গা / ধুন্দল মিষ্টি কুমড়া / কাকরোল / চাল কুমড়া / লালশাক / কলমিশাক	প্রতি জনের জন্য কমপক্ষে ৫/৬ ধরনের সবজি বীজ বিতরণ করতে হবে	থোক	থোক	থোক	৩০০
শীতকালীন সবজি বীজ: লাউ / করলা / টমেটো / শিম / বরবটি / লাল শাক/ পালংশাক/ কলমিশাক	প্রতি জনের জন্য কমপক্ষে ৫/৬ ধরনের সবজি বীজ বিতরণ করতে হবে।	থোক	থোক	থোক	৩০০
ইউরিয়া		৬	কেজি	১৬	৯৬
টিএসপি		৪	কেজি	২২	৮৮
এমওটি		৪	কেজি	১৫	৬০
জিপসাম		০.৫	কেজি	৩৫	১৭.৫
জিংক সালফেট		০.৫	কেজি	২৫৫	১২৭.৫
বোরন		০.৫	কেজি	২৫৫	১২৭.৫
গোবর (উপকারভোগীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত)		৩০	কেজি	০	০
জৈব সার		২০	কেজি	২৫	৫০০
জৈব কীটনাশক	Nimbicidin-২৫০ মি:লি: বোতল	১	বোতল		২৫০
ফানজিচাইড	Propiconzol-১০০ মি:লি:	১	বোতল		২৫০
প্লাস্টিক ড্রাম	সাইজ-৬০ লিটার, বিদেশি তৈরি, মোটা এবং ছোট মুখ	৮	সংখ্যা	৬০০	৪৮০০
প্লাস্টিক এর ফলের ঝুড়ি		৮	সংখ্যা	২০০	১৬০০
বাঁশ	বরাক বাঁশ (৫০ফুটের মধ্যে)	৬	সংখ্যা	৫০০	৩০০০
নেট/জাল (মাচার জন্য)	নিউ সাইন নেট (ইলিশ নেট) কট সুতার তৈরি	১	কেজি	৪৫০	৪৫০
খুঁটি (উপকারভোগীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত) লেবার		প্রয়োজন অনুযায়ী		০	০
লেবার		২	দৈনিক	৫০০	১০০০
সাইনবোর্ড	২ ফুট X ৩ ফুট	১		৫০০	৫০০
রশি	নাইলন	১	কেজি	৪০০	৪০০
পেরেক		০.৫	কেজি	১৩০	৬৫
মালামাল পরিবহন খরচ উপকারভোগীর জন্য		-	-	৩০০	৩০০
অন্যান্য খরচ		-	-	৭৬৮.৫	৭৬৮.৫

(কথায়ঃ পনেরো হাজার টাকা মাত্র) সর্ব মোট টাকা- ১৫০০০

তথ্যসূত্র

- WorldFish. "Floating gardens can feed Bangladesh" Article, http://www.worldfishcenter.org/featured/floating-gardens-can-feed-bangladesh 11 October 2013
- ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ , ডিএই, কৃষিমন্ত্রণালয়।
- কৃষকের কথা বলছি, মোঃ মতিয়ার রহমান, প্রান্ত প্রকাশন, ২০১৫

বস্তায় সবজি চাষ

বস্তায় সবজি চাষ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় প্রতিনিয়তই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ও অভিনব পদ্ধতি। বস্তায় সবজি চাষ এ ধরনের একটি জলবায়ু সহনশীল, প্রতিবেশভিত্তিক ও অভিনব পদ্ধতির নাম। ভূমির লবণাক্ততার ফলে উপকূলীয় এলাকায় যেখানে প্রচলিত উপায়ে চাষাবাদ করার সুযোগ নেই সেসব প্রান্তিক ভূমিহীন পরিবারের জন্য বস্তায় সবজি চাষ খুবই উপযোগী। পরিবারের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্যে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী।

উপকূলীয় এলাকায় উপযোগিতা

ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার প্রভাব অনেক বেড়েছে। ফলে উপকূলের ফসলি জমিতে শাক-সবজির আবাদ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেচের জন্য মিষ্টি পানির উৎস ঘাটতি, জোয়ারভাটা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং মৌসুমি খরায় স্থানীয় কৃষকদের মাঝে অনীহা তৈরি হয়েছে। এমতাবস্থায় বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ কৃষকদের এনে দিচ্ছে স্বস্তি। বিশেষ করে কক্সবাজার, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা উপকূলীয় এলাকায় বস্তায় সবজি চাষ অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে।

এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মাটিবাহিত রোগের আক্রমণ অনেক কম হয় অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে বস্তা অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া যায়। বাড়ির উঠান, ঘরের প্রাচীরের কোল ঘেঁষে বা বাড়ির আশেপাশের ফাঁকা জায়গা অথবা বাড়ির ছাদে বস্তা সাময়িকভাবে রাখা যায়।

বস্তায় সবজি চাষের বৈশিষ্ট্য

- চাষের জন্য আলাদা জমির দরকার হয় না।
- অতিবৃষ্টি বা বন্যায় ফসল ডুবে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নেই।
- একটি ফসল তোলার পর সেখানে আলাদা করে কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই আরেকটি ফসল ফলানো যায়।
- আংশিক ছায়াযুক্ত জায়গাতে এই পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।
- বাঁশবাগানের তলায় বস্তায় আদা ও হলুদ চাষ করা যায়।
- খরচ খুবই কম।

শাক-সবজির চাষ বিন্যাস

গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজিঃ পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, লালশাক, কলমিশাক, ঢেঁড়স, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদির ওপর পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক ও আশাব্যঞ্জক। পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, মুলাসহ বিভিন্ন সবজি সারা বছরব্যাপী উৎপাদন করা সম্ভব।

লতাজাতীয় শাক-সবজিঃ লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, শসা, করলা/উচ্ছে ইত্যাদি বীজ থেকে চারা গজিয়ে বাঁশ, বাঁশের কঞ্চি ও সুতা দিয়ে বুনে ভালো করে চালা/মাচান তৈরি করা হয়।

মসলা ফসলঃ মরিচ, আদা ও হলুদ।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ সিনথেটিক বস্তা, পাটের বস্তা, বীজ, পরিমিত মাটি, গোবর, ছাই, সুতা ইত্যাদি।

চাষ পদ্ধতি

প্রথমেই একটি বড় আকৃতির পরিত্যক্ত সিমেন্টের বা আলুর বস্তা ব্যবহার করা হয়। অতঃপর পলি-দোআঁশ মাটির ঢেলা ভাঙতে হবে। মাটি ভালো করে চেলে নিতে হবে যাতে ঝুরঝুরে হয়। একটি বস্তায় তিন ঝুড়ি মাটি, এক ঝুড়ি বালি, এক ঝুড়ি গোবর সার ও ২৫ গ্রাম ফিউরাডন লাগবে। অন্যান্য সার টিএসপি-২০০ গ্রাম, এমপি-২০০ গ্রাম, জিঙ্ক ও বোরন-পরিমাণমতো। বস্তায় মাটির সাথে পরিমাণমতো যোগ করতে হবে ভার্মি কম্পোস্ট, হাড়ের গুঁড়ো ও ছাই। বালি পানি নিষ্কাশনে সাহায্য করে, ফিউরাডন উইপোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করবে। মাটির সঙ্গে গোবর, বালি ও ফিউরাডন ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর প্রস্তুত করা মাটি বস্তায় দিতে হবে। সিমেন্টের বস্তায় ভরে ঝাঁকিয়ে নিলে তাতে মাটির মিশ্রণটি ভালোভাবে চেপে যাবে। বস্তার নিচে তিন-চার কেজি শুকনো পাতা বা খড় বিছিয়ে দিতে হবে। মাটি যেন জমাট বাঁধতে না পারে সেজন্য বস্তার ঠিক মাঝখানে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ২০ থেকে ৪০ মিমি মাপের ইটের টুকরো বা খোয়া দিতে হবে। বস্তায় বীজ বপন করে চাষ করা যাবে। তবে চারা তৈরি করে লাগিয়ে দেওয়াই ভালো।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সকাল-বিকেল পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পানি দেওয়া দরকার। বৃষ্টি হলে দু-তিন দিন পানি না দিলেও সমস্যা হয় না। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন বস্তায় অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে এবং বেশি শুকিয়ে না যায়।

ফসল সংগ্রহ

দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে সবজি উত্তোলন শুরু হয়। ছোট পরিবারের দৈনিক খাবারের সবজি পাওয়া যায় বিধায় প্রান্তিক কৃষক পরিবারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এছাড়া নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রি করা যায়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ১০-১৫ টি বস্তায় সবজি চাষ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে ভালো আয় করা যায়।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

খরচের খাত	টাকা	আয়
মাচা তৈরি এবং ১০-১৫ টি বস্তার খরচসহ	২০০০.০০	মৌসুম শেষে ১০-১৫টি বস্তা থেকে পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে প্রায় ১০,০০০.০০-১২,০০০.০০ টাকা আয় করা যায়
গোবর সার	১০০.০০	
ভার্মি কম্পোস্ট সার	২০০.০০	
টিএসপি-২০০ গ্রাম, এমপি-২০০ গ্রাম	১০০.০০	
মোট খরচ	**২৪০০.০০**	

জলাবদ্ধ লবণাক্ত ভূমিতে বস্তায় সবজি চাষ

ঝুলন্ত ও সিঁড়ি পদ্ধতিতে সবজি চাষ

উপকূলীয় এলাকায় লোনা পানির অনুপ্রবেশের কারণে মাটির লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও কৃষিতে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে চাষাবাদ উপযোগী মাটি দিনের পর দিন চাষের অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে উপকূলীয় বন্যা (জুন থেকে অক্টোবর), জোয়ারের লবণ পানি ও সরাসরি লবণাক্ত পানি দিয়ে জমি ডুবে যাওয়া এবং শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর থেকে মে) মাটির নিচে থাকা লবণাক্ত পানি উপরের দিকে বা পাশের দিকে প্রবাহিত হওয়ার কারণে মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, যা মাটির উর্বরতা নষ্ট করছে। বাংলাদেশের ২.৫ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চল। বর্তমানে উপকূলীয় এলাকা এবং দূরবর্তী দ্বীপসমূহের ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর লোনা পানি প্রবেশ করার ফলে আবাদি জমি, উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূ-গর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। লবণাক্ততার কারণে এসব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ আবাদি জমি পতিত থাকে। সিঁড়ি বা ঝুলন্ত পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করলে একদিকে যেমন পতিত, জলাবদ্ধ ও লবণাক্ত মাটির পুনঃব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব অন্যদিকে টাটকা শাক-সবজি উৎপাদন করে পারিবারিকভাবে পুষ্টি চাহিদা মেটানো সম্ভব।

উপকূলীয় এলাকায় উপযোগিতা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশ -পরিস্থিতির সাথে মানুষ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে সবজি আবাদের জন্য সিঁড়ি/ঝুলন্ত পদ্ধতি একটি বিশেষ পদ্ধতি। যেহেতু উপকূলীয় এলাকার মোট জমির অর্ধেকেরও বেশি জমি লবণাক্ত, পতিত ও জলাবদ্ধ সেহেতু এই জমিতে মানুষকে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হলে নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার/অবলম্বন করতে হবে। এই পদ্ধতিতে মাটির লবণাক্ততা দূর করে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও সহায়ক বিধায় উপকূলীয় এলাকায় এর উপযুক্ততা অনেক বেশি।

কার্যক্রমের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য

- সর্বোচ্চ বন্যাস্তর বিবেচনা করে বাঁশের মাধ্যমে সিঁড়ি আকারে নিচ থেকে উপরের দিকে উঁচু করে কাঠামো তৈরি করতে পারে বা ঝুলন্ত পদ্ধতিতে ঝুড়ির মাধ্যমে চাষ করতে পারে।
- বন্যার পানি ক্ষতি করতে পারবে না।
- গাছের আন্তঃপরিচর্যা করা সহজ ও কৃষক নিজেই উৎপাদন করতে পারবেন।
- গরু-ছাগল গাছ নষ্ট করতে পারবে না।
- এই পদ্ধতিতে টমেটো, বেগুন, মরিচ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, পুঁইশাক, গুলমরিচ/বোম মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, মুলা, গাজর ইত্যাদি সবজি উৎপাদন করতে পারবে।
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।
- বীজ বপন বা চারা রোপণ পদ্ধতি সহজ ও সারা বছর চাষ করা সম্ভব।
- প্রস্তুতকৃত মাটির বুনট ও গঠন শক্তিশালী হয়, যা গাছের শিকড় বিস্তারে সহায়ক।
- মাটির স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় রাখতে সহায়ক ও মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- সবজি উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ ও সময় কম লাগে এবং পরিবেশবান্ধব।

সিঁড়ি/ঝুলন্ত কাঠামো তৈরির উপকরণ

বাঁশ, রশি, প্লাস্টিক টব/ফলের ঝুড়ি, বীজ/চারা, অর্গানিক ফার্টিলাইজার/গোবর, লেবার, লবণমুক্ত মাটি

সিঁড়ি/ঝুলন্ত কাঠামো স্থাপনের স্থান নির্বাচন

বাড়ি ভিটার নিকটের নিচু/পতিত জায়গা, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে এবং বাতাস চলাচল করে। বাড়ির সামনে বা নিকটে হলে আরও ভালো। এতে করে খুব সহজেই পরিচর্যা করা যায়।

সিঁড়ি/ঝুলন্ত কাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়া

- স্থানীয় বাঁশ সংগ্রহ করে ১২ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থ আকারের খণ্ড খণ্ড করে কেটে নিতে হবে এবং প্রত্যেকটি সিঁড়ির উচ্চতা অনুসারে পরিমাণমতো খুঁটি কেটে খণ্ড খণ্ড করতে হবে। ঝুলন্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি দোচালা ঘরের কাঠামো তৈরির মতো করে বাঁশ কেটে নিতে হবে।
- দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের খণ্ডিত বাঁশের মাঝামাঝি চিরে দুটি করে খণ্ড বের করতে হবে। ঝুলন্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক শতাংশ জমিতে যে পরিমাণ বাঁশ লাগে সে পরিমাণ বাঁশগুলোকে কেটে কেটে ৬টি খুঁটি ও চালের জন্য পরিমাণমতো রুয়া, টুই ইত্যাদি অংশ বের করতে হবে।
- এরপর মাটিতে খুঁটি গেড়ে মাচার মতো করে ক্রমান্বয়ে রশির মাধ্যমে খণ্ডিত বাঁশগুলোকে মজবুত করে বেঁধে দিতে হবে। ঝুলন্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে দোচালা ঘর তৈরি করতে হবে।
- কাঠামো প্রস্তুত হয়ে গেলে সারি সারি করে মাটিভর্তি বালতি বা ফলের ঝুড়ি সিঁড়ির উপরে স্থাপন করতে হবে। ঝুলন্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঘরের চার পাশে রুয়ার সাথে মাটিভর্তি ফলের ঝুড়িগুলোকে রশির মাধ্যমে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে ঝুড়িগুলো ঝুলে থাকে।

মাটি প্রস্তুতসহ প্রয়োজনীয় কাজ

- বালতি/ঝুড়ি বা পাত্রের সংখ্যা অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব লবণমুক্ত মাটি সংগ্রহ করতে হবে।
- মাটিগুলোকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্তূপ করে বাজেটে বর্ণিত পরিমাণ অর্গানিক ফার্টিলাইজার/গোবর সার ভালোভাবে মিশিয়ে ৭ দিন ঢেকে রেখে দিতে হবে।
- ৭ দিন পরে উক্ত মাটি দ্বারা পাত্রগুলোকে ভরাট করতে হবে।
- অতঃপর পাত্রের মাঝামাঝি বীজ বপন/চারা রোপণ করে সিঁড়ি কাঠামোতে বা ঝুলন্ত কাঠামোতে স্থাপন করতে হবে।

সিঁড়ি কাঠামো নির্মাণে সম্ভাব্য খরচ/বাজেট

ক্র. নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট খরচ (টাকা)
১	বাঁশ ১৫টি	১৫টি	৫০০	৭৫০০
২	নাইলন রশি	৩ কেজি	৩০০	৯০০
৩	প্লাস্টিক টব/বালতি	৩৬ টি	১২০	৪৩২০
৪	বীজ/চারা	থোক	৫০০	৫০০
৫	জৈবসার	৫০ কেজি	৪০	২০০০
৬	শ্রমিক	৩ জন	৫০০	১৫০০
মোট:				১৬৭২০

ঝুলন্ত কাঠামো নির্মাণে সম্ভাব্য খরচ/বাজেট

ক্র. নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট খরচ (টাকা)
১	বাঁশ	১২টি	৫০০	৬০০০
২	নাইলন রশি	৪ কেজি	৩০০	১২০০
৩	মাচার জন্য নেট	১ কেজি	৩০০	৩০০
৪	প্লাস্টিক ক্যারেট/ কেইজ	১০ টি	২০০	২০০০
৫	বীজ/চারা	থোক	৫০০	৫০০
৬	জৈবসার	৫০ কেজি	৪০	২০০০
৭	শ্রমিক	২ জন	৫০০	১০০০
মোট:				১৩০০০

লাভ

সিঁড়ি বা ঝুলন্ত পদ্ধতিতে এককালীন খরচ হবে প্রায় ১২-১৩ হাজার টাকা। এর মাধ্যমে একটি পরিবার সারা বছরের শাক-সবজির চাহিদা মিটিয়ে বছরে কম করে হলেও ১০ হাজার টাকা আয় করতে পারবেন।

সুবিধা

- পতিত জমি কখনো পতিত থাকবে না।
- সবজি চাষের জন্য মাত্র ১ শতাংশ জমি প্রয়োজন।
- সারা বছর পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে এমন জমিতে চাষাবাদ করা যায়।
- অবকাঠামো একবার প্রস্তুত হয়ে গেলে ৪/৫ বছর সবজি চাষ করা যায়।
- স্থানীয়ভাবে উপযোগী এবং কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মৌসুমভিত্তিক সবজি চাষ করা যায়।
- বিনিয়োগের টাকা প্রথম বছরেই তুলে নেওয়া সম্ভব।

উপকূলীয় জোয়ার-ভাটাসমৃদ্ধ এলাকার, গরিব ও দরিদ্র কৃষক যাদের নিচু জমি আছে কিন্তু সারা বছর লবণাক্ততার কারণে পতিত থাকে, তাদেরকে সিঁড়ি/ঝুলন্ত পদ্ধতিতে সবজি চাষে সম্পৃক্ত করে নিরাপদ কৃষিব্যবস্থার প্রসার ঘটানো ও পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এ লক্ষে আইসিবিএএআর প্রকল্প সর্বাধিক জলাবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে নারী বান্ধব এ প্রযুক্তিটির প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটি মূলত জলাবায়ু যুদ্ধ মোকাবিলায় এ ধরনের প্রতিবেশভিত্তিক জীবিকায়ন নিয়ে কাজ করছে।

উফশী জাতের টি-আমন ধান চাষ

উফশী জাতের টি-আমন ধান চাষ

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে এই কৃষির ওপর। বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, অতিবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি কারণে দেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রচলিত আউশ ও আমন ধানের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় টি-আমন ধানের ব্যবহার একটি সময় উপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আইসিবিএ-এআর প্রকল্পের আওতায় যে জলবায়ু সহনশীল উন্নত জাতের টি-আমন ধানের চাষ প্রচলন করছে তা উপকূলীয় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশেষভাবে উপযোগী।

জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও অন্যান্য সুবিধাদি

টি-আমন জলবায়ু সহিষ্ণু। যেমন: লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রী ধান-৪৭ ও ৭৪ জাত, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ব্রী ধান-৫২ ও খরা সহিষ্ণু ব্রী ধান-৫৮। প্রচলিত দেশি জাতের ধানের তুলনায় টি-আমন ধান চাষে ১০-১৫ দিন সময় কম লাগে। ফলে বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগেই ফসল ঘরে তোলা যায়। পরবর্তী ফসলের জন্য কৃষক প্রস্তুতি নিতে পারে। যেখানে দেশি জাতের ধান উৎপাদনের হার শতাংশ প্রতি ২০-২২ কেজি সেখানে টি-আমন ধানের উৎপাদন শতাংশ প্রতি ৩০-৩৫ কেজি।

টি-আমন ধান লবণাক্ততা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও বন্যার পানিতে কিছু দিন ডুবে থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ভারী বাতাসের কারণে সহজে পড়ে যায় না। অল্প সময়ের মধ্যে ফসল ঘরে তোলা যায়। ফলে বন্যা থেকে যেমন রক্ষা পায় তেমনি ওই একই জমিতে বছরে আরেকটি ফসল অধিক ফলানো যায়। প্রকল্পের উপকারভোগীদের দেখাদেখি এই ধান চাষে উপকূলের এখন অনেকেই উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

উপকূলীর এলাকায় টি-আমন চাষের উপযোগিতা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উপকূলীয় এলাকার বেশিরভাগ ফসলি জমিতে প্রচলিত স্থানীয় জাতের আবাদ প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। সেচের পানির উৎস ঘাটতি, জোয়ার-ভাটায় লবণাক্ত পানির প্রাদুর্ভাব,অতিবৃষ্টি বা মৌসুমি খরায় আউশ ও বোরো ধান চাষে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে অনীহা তৈরি হয়েছে। টি-আমন ধানের বিভিন্ন জাত জলাবদ্ধতা, বৃষ্টি, মৌসুমি খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল হওয়ায় এবং প্রচলিত জাতের তুলনায় ১০-১৫ দিন আগে উচ্চফলনশীল উৎপাদনের কারণে টি-আমন নতুন সম্ভাবনাময় জাত হিসেবে উপকূলে সমাদৃত হচ্ছে। স্বল্প জীবনকাল সম্পূর্ণ নতুন নতুন আমন ধানের জাতগুলো হলো: বিরি ধান ৫২, বিরি ধান ৬২, বিরি ধান ৬৬ ও বিরি ধান ৭৫ ইত্যাদি।

উপকারভোগীদের সাথে কৃষি কর্মকর্তার মত বিনিময়

বীজতলা তৈরি

সেচ সুবিধাযুক্ত এবং প্রচুর আলো-বাতাস পায় এমন স্থান বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। জমি ভালোভাবে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে থকথকে কাদাময় করে তৈরি করতে হবে। জমির এক পাশ থেকে ১.২৫ মিটার (৪৯.২১ ইঞ্চি) চওড়া করে লম্বালম্বিভাবে বীজতলা তৈরি করতে হবে। দুই বীজতলার মাঝে ৫০ সে.মি. (১৯.৬৯ ইঞ্চি) জায়গা ফাঁকা রেখে এবং এই ফাঁকা জায়গা থেকে মাটি তুলে নিয়ে দুই পাশের বীজতলাকে একটু উঁচু করতে হবে। এতে ফাঁকা জায়গায় যে নালার সৃষ্টি হয় তা দিয়ে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হবে।

বীজ বপনের আগে বীজতলাকে ভালোভাবে সমান করে নিতে হবে। অতঃপর প্রতি বর্গমিটার বীজতলায় ৮০-১০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে। প্রতি ৩৩ শতক জমিতে রোপণের জন্য ৩৪ কেজি বীজের প্রয়োজন। ৬ শ্রাবণ থেকে ৫ ভাদ্র বা ২১ জুলাই থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। এবং চারার বয়স ২১-২৫ দিন হলে জমিতে চারা রোপণ করতে হবে। এক একক পরিমাণ বীজতলার চারা দিয়ে বিশ একর পরিমাণ জমি রোপণ করা যায়।

বীজতলার পরিচর্যা

বীজ বপনের পর থেকে চারার শিকড় মাটিতে লেগে যাওয়া পর্যন্ত ৫-৭ দিন সেচের পানি দিতে হবে, যাতে বীজতলা না শুকায়। বীজ বপনের ৫-৭ দিন পর বীজতলায় ছিপ ছিপে (২৩ সে.মি.) পানি রাখা হলে চারার বীজ বাড়ন্তি ভালো হয়। পরে চারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয় রেখে পানির পরিমাণ ৩৫ সে.মি. বাড়ানো যায়। তবে এর চেয়ে বেশি পানি রাখা হলে চারা লম্বা ও দুর্বল হয়ে যায়।কোনো কারণে চারার বৃদ্ধি কমে গেলে এবং গাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত হারে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণের পদ্ধতি

সাধারণত চারা রোপণের দূরত্বের ব্যবধানের জন্য টি-আমন ধানের ফলনের পার্থক্য হয়ে থাকে। সারি করে অথবা এলোমেলো দুভাবেই চারা রোপণ করা যায়। সারি করে রোপণ করা হলে সারি এবং গোছা একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে। কিন্তু এলোমেলোভাবে রোপণ করা হলে দুইগাছের মধ্যে দূরত্ব সমান থাকে না। কিন্তু সারি করে রোপণ করা হলে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং পরবর্তী পরিচর্যা বিশেষ করে আগাছা দমনে খরচ কম হয়। প্রতি গুছিতে দুই থেকে তিনটি চারা রোপণ করতে হবে। তাছাড়া প্রতিটি গুছি সমান দূরত্বে থাকে। ফলে সমানভাবে মাটি থেকে পুষ্টি নিয়ে ধানের ফলন বৃদ্ধি করতে পারে। চারা রোপণের জন্য সারি থেকে সারি ২০-২৫ সে.মি. (৮-১০ ইঞ্চি) এবং গুছি থেকে গুছি ১৫-২০ সে.মি. দূরত্বে দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

বীজতলায় সেচ: বীজতলা তৈরিতে মাটির অবস্থাভেদে ১০০-১৫০ মিলিমিটার (৪-৬ইঞ্চি) পানির প্রয়োজন হয়। প্রতিবার গড়ে ৩০-৪০ মিলিমিটার বা (১-১.৫ইঞ্চি) পানি দিলে সাধারণত ৪-৫ টা সেচের প্রয়োজন হয়।
বীজতলায় দুই বেডের মাঝে নালার মধ্যে সেচ দেওয়া উত্তম।

জমি তৈরিতে সেচ: জমিতে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে মাটির প্রকারভেদে দুই তিনটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থক থকে কাদাময় করতে হবে। এতে ২০০-২৫০ মিলিমিটার (৮-১০ ইঞ্চি) সেচের পানির প্রয়োজন হয়।

ধানের জীবনকালের সেচ: মাটির প্রকারভেদে চারা রোপণের পর থেকে ধান কাটা পর্যন্ত ১০০০-১২০০ মিলিমিটার(৪০-৪৮ ইঞ্চি) পানির প্রয়োজন হয়, যা ১৬-২০ বার সেচের মাধ্যমে দিতে হয়।

উফশী জাতের টি-আমন ধান চাষ

উপকারভোগীর সাথে কৃষি কর্মকর্তার মত বিনিময়

ধান উৎপাদন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা

সুষম সারের প্রয়োজনীয়তা: গাছের বৃদ্ধি এবং জীবনচক্র সম্পন্ন করার জন্য ১৬ টি মৌলিক পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন। এসব পুষ্টি উপাদানের ৩টি আসে পানি ও বাতাস থেকে বাকি ১৩টি আসে মাটি থেকে। এদের যেকোনো একটির অভাবে গাছের জীবনকাল পূর্ণ হতে পারে না। গাছের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন অবস্থায় ও আনুপাতিক হারে মাটিতে বিদ্যমান থাকে। অসমহারে যথেষ্ট সার ব্যবহার ও নিবিড় চাষাবাদের কারণে মাটিতে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পায়। এজন্য সুষমহারে সার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

ধানের পুষ্টি উপাদান চাহিদার পরিমাণ

সাধারণত উচ্চ ফলনশীল টি-আমন ধানের পুষ্টি চাহিদা স্থানীয় জাতের পুষ্টি চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। এক টন টি-আমন ধান উৎপাদনে মাটি হতে সাধারণত ১৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৩ কেজি ফসফরাস, ২৪ কেজি পটাশিয়াম, ২ কেজি সালফার এবং অন্যান্য উপাদান আহরিত হয়ে থাকে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা চাহিদা

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা দু'ভাবে করা যায়, যেমন :

১. রোগাক্রমণের আগে করণীয়

- রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার যেমন :ব্রি ধান-১৯, ব্রি ধান-৪৫, ব্রি ধান-৫০, ব্রি ধান-২৭,আমন-বিআর-৪, ব্রি ধান-৩২, ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৪০, ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪২, ব্রি ধান-৪৪ও ব্রি ধান-৪৯।
- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ও ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ।

২. রোগাক্রান্ত মাঠে করণীয়: ঝড়োবৃষ্টির পর ইউরিয়া সার দেওয়া যাবে না। রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। রোগ দেখার পর বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ক্রিসেক আক্রান্ত জমি শুকিয়ে ৫-১০ দিন পর আবার পানি দিতে হবে। চারা উঠানোর সময় যেন শিকড় কম ছিঁড়ে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। রোগাক্রান্ত জমির নাড়া ও খড় পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

পোকামাকড়ের ধরন অনুযায়ী এর ব্যবস্থাও ভিন্ন হয়ে থাকে। নিম্নে পোকামাকড়ের ধরন অনুযায়ী এর ব্যবস্থাপনা তুলে ধরা হলো:

গলমাছিঃ আলোর ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক পোকা মেরে ফেলা। প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করা।তবে এক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ গল পাওয়া গেলেই শুধু কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

হলুদ মাজরা পোকাঃ মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলা। ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে দিয়ে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে পোকার সংখ্যা কমানো যায়। আলোর ফাঁদের সাহায্যে পোকা আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা। উপরিউক্ত উপায়ে দমন করা সম্ভব না হলে পরিমিত মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন করতে হবে।

পামরি পোকাঃ আক্রান্ত পাতার গোড়া থেকে ৩ সে.মি. উপরে পাতা কেটে নষ্ট করে ফেলা।তবে কাইচ থোড় আসার পর পাতা কাটলে ফলনের ক্ষতি হতে পারে। প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে শতকরা ৩৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেই কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত।

চুঙ্গি পোকাঃ আক্রান্ত জমির পানি বের করে দেওয়া। আলোর ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক মথ মেরে ফেলা। শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক ব্যবহারের চিন্তা করা যেতে পারে।

ঘাস ফড়িংঃ হাত জাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা। ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে দিয়ে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে পোকার সংখ্যা কমানো যায়। প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেই কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত।

বাদামি গাছ ফড়িংঃ আলোর ফাঁদ ব্যবহার,জমিতে থাকা পানি সরিয়ে ফেলা, উর্বর জমিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা। জমির অধিকাংশ গাছে যদি দুই থেকে চারটি পেটমোটা ডিমওয়ালা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী বাদামি গাছ ফড়িং বা ৮-১০ টি কিড়া উভয়ই দেখতে পাওয়া যায়,তাহলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।তবে কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

গান্ধি পোকাঃ আলোর ফাঁদের সাহায্যে দমন করা যায়।প্রয়োজনে শুধু অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে তবে কীটনাশক বিকেলে প্রয়োগ করতে হবে।

পাতা মোড়ানো পোকাঃ আলোর ফাঁদের সাহায্যে পোকা ধরে মেরে ফেলা।ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে দিয়ে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে পোকার সংখ্যা কমানো যায়। প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করা।এক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেই কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত।

ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা

- জমির আইল ও আশপাশ আবর্জনামুক্ত রাখা।
- আইল সরু (১৫-২০ সে.মি.) রাখা।
- গর্ত খুঁড়ে ইঁদুর নিধন করা।
- গর্তে পানি অথবা মরিচের ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলা।
- ইঁদুরের গর্তের পাশে মূর্তি স্থাপন করা।
- বিভিন্ন প্রকারের ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা।

প্রকল্পের কৃষক মাঠ দিবস উদযাপন

টি-আমন ধানের ইতিবাচক দিক

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় টি-আমন ধানের ব্যবহার এক সময় উপযোগী যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ধান উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে শহরে পাড়ি দিয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ও আইসিবিএ-এআর প্রকল্পের সহযোগিতায় জলবায়ু সহনশীল উন্নত জাতের টি-আমন ধানের চাষ করায় উপকূলীয় কৃষকরা যেমনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সামর্থ্য হচ্ছে তেমনি অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে দিন দিন মুক্ত হচ্ছেন।

ফসল সংগ্রহ

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে অথবা ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে ফসল কাটতে হবে। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কেটে নেওয়া উচিত।

চাষি পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণ

বীজ ঠিকমতো শুকিয়ে নিতে হবে যাতে এর আর্দ্রতা ১২-১৩% অথবা এর নিচে থাকে। প্লাস্টিক ড্রাম, টিন বা অন্য কোনো ধাতব পাত্র এবং রংকরা মটকা ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। পাত্রে রাখার আগে বীজ ঠান্ডা করে নিতে হবে এবং প্রয়োজনমতো নিম পাতা বা তামাক পাতা পাত্রের ভিতরে রাখলে পোকা দমনে কাজ করে। পাত্র পূর্ণ করে বীজ রাখতে হবে। যদি পাত্রের কিছু অংশ খালি থাকে তাহলে তা ছাই দিয়ে পূর্ণ করে নিতে হবে।তারপর পাত্রের মুখটি ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে আলো-বাতাস ঢুকতে না পারে। বীজ বোনার সময় ছাড়া পাত্রটি খোলার বা বীজ রোদে দেওয়ার দরকার নেই।

তথ্যসূত্র

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পুস্তক, ওয়েবসাইট ও এনজিও ম্যানুয়ালসহ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম অভিজ্ঞতা।

কেঁচো সার

কেঁচো সার একটি পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রাকৃতিক জৈব সার। বিশেষ প্রজাতির কেঁচো ব্যবহার করে কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর বর্জ্য ও দেহবিশেষকে প্রক্রিয়াজাতকরণের পর যে সার পাওয়া যায় তাই কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট। জৈব পদার্থ খাওয়ার পর কেঁচো যে মল ত্যাগ করে তাই কেঁচো সার।

কেঁচো সারকে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি হাতিয়ারও বলা যেতে পারে যা মাটিতে জৈব উপাদান বৃদ্ধিতে সহায়ক। অধিক শস্য নিবিড়তা ও জৈব ফলনশীল শস্য আবাদের ফলে দিন দিন মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ কমছে। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় কেঁচো সারের কোনো বিকল্প নেই এবং এটি একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক তেমনি মাটির পুষ্টিগুণ বজায় রেখে মাটিকে বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে রক্ষা করে।

কেঁচোর মুখের লালা মাটির জন্য ভিটামিন। এতে অধিক পরিমাণে মাইক্রোঅরগানিজম থাকে যা মাটিতে পুষ্টি উপাদান সংযোজন করে। এটি মাটিকে ঢিলাঢালা রাখে। মাটির মধ্যে বিদ্যমান বিষক্রিয়াকে কমায়। জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাফল্য রয়েছে।

বর্তমানে আমাদের দেশের বিভিন্ন খামারে পর্যাপ্ত কেঁচো পাওয়া যায়। দেশে পর্যাপ্ত কেঁচো মজুদ থাকায় কেজি প্রতি স্থানভেদে ২০০০-২৫০০ টাকায় পাওয়া যায়। সব প্রজাতির কেঁচো ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির জন্য উপযোগী নয়, এ কাজে Red worm/Red wigglers (*Eisenia fetida)* বহুল ব্যবহৃত প্রজাতি।

উপকূলীয় এলাকার উপযোগিতা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি কারণে উপকূলীয় এলাকার আবাদি জমি সাগর বা নদীর লবণ পানির মাধ্যমে দিনের পর দিন অনাবাদি হয়ে যাচ্ছে এবং রাসায়নিক সার ঘন ঘন ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও কৃষকের অসচেতনতা ও অপরিকল্পিতভাবে সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে মাটির লবণাক্ততা দূরীকরণ সম্ভব ও শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও শতভাগ সহায়ক বিধায় উপকূলীয় এলাকায় এর উপযুক্ততা অনেক বেশি।

কেঁচোর উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ

এটি মাটির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে খনন, চলন, আহার এবং পাচ্য পদার্থ মলরূপে নিষ্কাশন করে। এসব কার্যকলাপ নির্ভর করে মাটির অম্লতা (pH), জৈব পদার্থের পরিমাণ, পানি, তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর। সুতরাং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে Red worm/Red wigglers (*Eisenia fetida*) প্রজাতির কেঁচোর প্রয়োজন যা দেশেই পাওয়া যাচ্ছে। কেঁচো ৩ মিটার পর্যন্ত কর্ষণ করে। ফলে মাটিতে ছিদ্রের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মাটির গহ্বরে পানি প্রবেশ করতে সাহায্য করে। মাটির তলায় পানির মাত্রা বৃদ্ধি পায়, মাটির ভিতরে তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা এবং বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। কেঁচো তার পৌষ্টিকতন্ত্রের সাহায্যে মাটির কণাকে ভেঙে দেয় এবং মাটির ভেতরে অবস্থিত গাছের খাদ্য উপাদানগুলোকে সহজলভ্য করে তোলে। মাটি কণা ছোট হওয়ার ফলে আয়তন বেড়ে যায় মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলন মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কেঁচোর উপস্থিতিতে মাটিতে বায়ু চলাচল ক্ষমতা ৮-৬৭ ভাগ বৃদ্ধি পেতে পারে।

ভার্মি/কেঁচো কম্পোস্টের পুষ্টি উপাদান

মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা, উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন, কেঁচো কম্পোস্ট অন্যান্য কম্পোস্টের চেয়ে পুষ্টিমান বেশি (নাইট্রোজেনের শতকরা হার ১.০, ফসফেটের শতকরা হার ১.০, পটাশিয়ামের শতকরা হার ১.০, জৈব কার্বনের শতকরা হার ১৮.০, পানির শতকরা হার ১৫-২৫)।

কেঁচো সারের পুষ্টি উপাদান

- পরিবেশবান্ধব ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখে।
- মাটির স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় রাখতে সহায়ক ও মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- মাটির বিষক্রিয়া কমাতে সাহায্য করে।
- মাটিতে অনুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাটির বুনট ও গঠন শক্তিশালী হয়, যা গাছের শিকড় বিস্তারে সহায়ক।
- যেকোনো ফসলে ব্যবহারের উপযোগী।
- অনুর্বর মাটিকে উর্বর করে।
- উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ ও সময় কম লাগে।
- কৃষক নিজেই উৎপাদন করতে পারেন।

কেঁচো সার তৈরির উপকরণ

- বিশেষ প্রজাতির কেঁচো।
- স্যানিটারি রিং বা পাকা হাউজ।
- পলিথিন।
- চালা তৈরির জন্য টিন বা খড়।
- গোবর।
- গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা।
- তরকারি, কলাই, সরিষা, গমের খোসা।
- লতা-পাতাসহ পচা আবর্জনা, শহরের আবর্জনা।
- কৃষিজ বর্জ্য/ফসলের অবশেষ (ধান ও গমের খড়, তুষ, ভুসি)।

কেঁচো সার তৈরিতে যেসব বর্জ্য ব্যবহার করা উচিত নয়

- পেঁয়াজের খোসা, শুকনো পাতা, মরিচ, মসলা, অম্ল সৃষ্টিকারী বর্জ্য যেমন: টমেটো, তেঁতুল, লেবু, কাঁচা বা রান্না করা মাছ, মাংসের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি।
  অজৈব পদার্থ যেমন: পাথর, ইটের টুকরা, বালি, পলিথিন ইত্যাদি।

কেঁচো সার স্থাপনের স্থান নির্বাচন

- ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গা, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পড়বে না এবং বাতাস চলাচল করবে।
- উপরে ছাউনি দিতে হবে।

ফসল অনুযায়ী কেঁচো সার ব্যবহারের সম্ভাব্য পরিমাণ

ফসল	প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
ধান, গম, পাট	৪-৫ কেজি/শতাংশ	জমি তৈরির সময়
আলু, কচু, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, শাক-সবজি, ভুট্টা	৫-৬ কেজি/শতাংশ	জমি তৈরির সময়
ফলদ, বনজ বৃক্ষ	১ কেজি/গাছ	গাছের গোড়ায় রিং করে
কলা, পেঁপে	১-২ কেজি/গাছ	গাছের গোড়ার চারদিকে পরিখা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে
লাউ, কুমড়া, চিচিঙ্গা, সা, ঝিঙ্গা, করলা, শিম, পটল, কাঁকরোল	১ কেজি/মাদা	মাদা তৈরির সময়
পান বরজ	৫-৬ কেজি/শতাংশ	মাটি দেওয়ার সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে

কেঁচো সার প্রস্তুতপ্রণালি

- মাটির পাত্র, কাঠের বাক্স, সিমেন্টের পাত্র, পাকা চৌবাচ্চা বা মাটির উপরেও কেঁচো সার প্রস্তুত করা যায়। একটি ৫-৬ ফুট বা ৩-২ ফুট চৌবাচ্চা তৈরি করে নিলে ভালো হয়। পাত্র যাই হোক না কেন উচ্চতা ১-১.৫ ফুট হতে হবে এবং এর তলদেশে ছিদ্র থাকতে হবে যাতে কোনোক্রমেই পাত্রে পানি জমতে না পারে।
- প্রথমে চৌবাচ্চা বা পাত্রের তলদেশে ৩ ইঞ্চি বা ৭.৫ সেন্টিমিটার ইটের টুকরা, পাথরের কুচি ইত্যাদি দিতে হবে। তার উপরে ১ ইঞ্চি বালির আস্তরণ দিতে হবে যাতে পানি জমতে না পারে।
- বালির উপর গোটা খড় বা সহজে পচবে এমন জৈব বস্তু বিছিয়ে বিছানার মতো তৈরি করতে হবে। এরপর আংশিক পচা জৈব খাবার ছায়াতে ছড়িয়ে ঠান্ডা করে বিছানার উপর বিছিয়ে দিতে হবে
- খাবারে পানির পরিমাণ কম থাকলে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে যাতে ৫০-৬০ শতাংশ পানি থাকে।
- খাবারের উপরে প্রাপ্তবয়স্ক কেঁচো গড়ে কেজি প্রতি ১০টি করে ছেড়ে দিতে হবে। কেঁচোগুলো প্রাথমিকভাবে স্থির থাকার পর ১ মিনিটের মধ্যেই খাবারের ভেতরে চলে যাবে।
- ভেজা চটের বস্তা/নারিকেল পাতা ইত্যাদি দিয়ে জৈব বস্তু/দ্রব্য পুরোপুরি ঢেকে দিতে হবে।
- মাঝে মাঝে হালকা পানির ছিটা দিতে হবে, লক্ষ রাখতে হবে যাতে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার না হয়।

এভাবে সর্বোচ্চ ২ মাসের মধ্যে ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার তৈরি হয়ে যাবে (জৈব বস্তুর উপরের স্তরে কালচে বাদামি রং বা চায়ের মতো দানা ছড়িয়ে থাকতে দেখলে ধরে নেওয়া হয় কেঁচো সার তৈরি হয়ে গেছে)।

কেঁচো সার তৈরির সময় করণীয় পদক্ষেপসমূহ

- কম্পোস্ট তৈরি করার পাত্রে জৈব বস্তু, গোবর, মাটি ও খামারজাত সার নির্দিষ্ট অনুপাতে (৬৩ঃ০.৫ঃ০.৫) অর্থাৎ জৈব আবর্জনা ৬ ভাগ, কাঁচা গোবর ৩ ভাগ, মাটি ১/২ ভাগ এবং খামারজাত সার ১/২ ভাগ মিশিয়ে আংশিক পচনের জন্য স্তূপাকারে ১৫ থেকে ২০ দিন রেখে দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ মিশ্রিত পদার্থকে কেঁচোর খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে ১ মিটার লম্বা, ১ মিটার চওড়া ও ৩ সেমি. গভীর আয়তনের গর্ত/পাত্রের জন্য ৪০ কিলোগ্রাম খাবারের প্রয়োজন হয়। এরকম আয়তনবিশিষ্ট একটি গর্ত বা পাত্রে ১০০০ কেঁচো প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রথমদিকে কম্পোস্ট তৈরি হতে সময় বেশি লাগতে পারে (৬০-৭০ দিন)। পরবর্তীতে মাত্র ৪০ দিনেই কম্পোস্ট তৈরি সম্পন্ন হয়। কারণ অনুজীব ও কেঁচো উভয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।

সতর্কতা

সাধারণত পিঁপড়া, উইপোকা, তেলাপোকা, মুরগি, ইঁদুর, পানি এসব কেঁচোর বড় শত্রু। এরা যেন কেঁচোর উৎপাদন স্থানের কাছে আসতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অতিরিক্ত পরিমাণে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করা উচিত নয়, তাতে কেঁচোর ক্ষতি হতে পারে।

কেঁচো সার সরবরাহ ও সংরক্ষণ

গোবর যখন চা পাতার মতো ঝুরঝুরে হয়েছে, তখন রিং বা হাউজ থেকে তুলে চালুনির মাধ্যমে চেলে সার আলাদা করতে হবে। সার পলি ব্যাগে প্যাকেট করে ১ বছর পর্যন্ত ১৮-২০% আর্দ্রতায় রাখা যাবে ।

খরচের বিবরণ

বিবরণ	পরিমাণ	একক খরচ(টাকা)	মোট খরচ (টাকা)
সিমেন্টের রিং	৩টি	৩০০.০০	৯০০.০০
কেঁচো	০.৭৫ কেজি	২০০০.০০	১৫০০.০০
সিমেন্ট দ্বারা ভিটি পাকাকরণ	৩টি	১৫০.০০	৪৫০.০০
সাইনবোর্ড তৈরি (সাইজ: ৩ফুট/ ২ফুট)	১টি	৫০০.০০	৫০০.০০
সেড তৈরির পলিথিন, বাঁশের চাটাই ও খুঁটি বাবদ	থোক	৯০০.০০	৯০০.০০
আনুষঙ্গিক (পরিবহন, রেজিস্টার ও অন্যান্য)	থোক	২৫০.০০	২৫০.০০
		মোট:	৪৫০০.০০

লাভ/ক্ষতি বিশ্লেষণ

কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য ভার্মি কম্পোস্ট/ কেঁচো সার একটি লাগসই প্রযুক্তি। কেঁচো সার স্বল্প পুঁজিতে লাভবান সফল ব্যবসা বলে বিবেচিত হচ্ছে। এটি এখন অনেক দরিদ্র পরিবারের কর্মসংস্থান ও আয়-রোজগারের অন্যতম সফল ব্যবসা।

ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে বিক্রয়ের মাধ্যমে গরিব কৃষক ও দরিদ্র মহিলাদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তারা কেঁচো কম্পোস্ট সহজলভ্য করে বাজারজাত করছে।

একজন কৃষক খুব অল্প সময়ে (প্রথমদিকে ৬০-৭০ দিন এবং পরবর্তীতে মাত্র ৪০ দিন) কম্পোস্ট তৈরি করতে পারবে। ভার্মি কম্পোস্ট তৈরিতে সম্ভাব্য খরচ/বাজেট অনুযায়ী কৃষকের খরচ হয় মাত্র ৪৫০০(চার হাজার পাঁচশত) টাকা এবং উক্ত খরচে ভার্মি কম্পোস্ট/কেঁচো সার উৎপাদন হবে কমপক্ষে ৬০০ কেজি।

প্রতি কেজি কম্পোস্ট-এর স্থানীয় (গ্রাম এলাকায়) মূল্য ২৫ (পঁচিশ) টাকা। ফলে ৬০০ কেজির মূল্য হয় ১৫০০০ টাকা। কৃষকের লাভ হবে ১৫,০০০.০০-৪৫০০.০০ অর্থাৎ ১০,৫০০.০০ টাকা।

পরে শেড বা অবকাঠামোগত কোনো খরচ হবে না। ৪-৫ বছর একই কাঠামো ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া কেঁচোও কিনতে হবে না। অধিকন্ত বেশি কম্পোস্ট তৈরি হবে। এর ফলে উপকারভোগীদের নিয়মিত একটি আয়ের উৎস হবে এই কম্পোস্ট। মাসে তারা ৫-৬ হাজার টাকা এ থেকে উপার্জন করতে পারবে।

তবে প্যাকেজিং করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে পারলে প্রতি কেজির মূল্য হবে ৪০(চল্লিশ) টাকা। সে ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও কিছুটা বাড়বে।

নির্বিচারে রাসায়নিক সার ব্যবহার ও নানা কারণে ভূমি ক্ষয়ের ফলে মাটি হয়ে যাচ্ছে বন্ধ্যা। আর জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিও এখন মারাত্মক হুমকির মধ্যে। কেঁচো হলো মাটির প্রাকৃতিক লাঙল। মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কেঁচো সার যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বাণিজ্যিকভাবেও লাভজনক। বিশ্বের মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা মত দিয়েছেন মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অন্তত ৫ ভাগ থাকা প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশের সব জায়গাতেই গড়ে এখন ১ ভাগে নেমে এসেছে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের মাটি আর চাষযোগ্য থাকবে না। এখনই সময় মাটি, কৃষি ও মানুষ বাঁচানোর এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার সাথে সাথে জীব-বৈচিত্র্যকেও রক্ষা করতে হবে।

তথ্যসুত্র

১. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন নির্দেশিকা- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২. প্র্যাকটিক্যাল একশান বাংলাদেশ
৩. ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম (ডিএই)
৪. জনাব চপল কৃষ্ণ নাথ, উপজেলা কৃষি অফিসার, মনপুরা, ভোলা
৬. কৃষি কথা, অগ্রহায়ণ, ১৪২০।

খাঁচায় মাছ চাষ

খাঁচায় মাছ চাষ

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে খাঁচায় মাছ চাষ নতুন আঙ্গিকে শুরু হলেও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে খাঁচায় মাছ চাষের ইতিহাস অনেক পুরোনো। ধারণা করা হয়, খাঁচায় মাছ চাষ শুরু হয় চীনের ইয়াংঝি নদীতে আনুমানিক ৭৫০ বছর আগে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে আধুনিককালে খাঁচায় মাছ চাষ ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ উপযোগী লাগসই খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হলো খাঁচায় মাছ চাষ।

খাঁচায় মাছ চাষ নদী বা জলাশয়ে প্রতিবেশভিত্তিক আধুনিক মাছ চাষের একটি পদ্ধতি। ২০০২ সালে থাইল্যান্ডের অনুকরণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রথম বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু হয়। তাই বাংলাদেশে এ ধরনের মাচ চাষ ডাকাতিয়া মডেল নামেও পরিচিত। এ পদ্ধতিতে খাঁচাকে পুকুরের মতো ব্যবহার করা যায় এবং বিভিন্ন জলাশয়ে অতিরিক্ত মাছ উৎপাদনের কৌশল হিসেবে এটি বেশ কার্যকর।

উপকূলীয় এলাকায় খাঁচায় মাছ চাষের উপযোগিতা

খাঁচায় মাছ চাষ উপকূলীয় ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর একটি অত্যন্ত উপযোগী এবং কার্যকর জলবায়ু সহনশীল বিকল্প জীবিকায়ন ব্যবস্থা। পদ্ধতিটি নদী, খাল ও পতিত পুকুর ব্যবহার করে ভূমিহীন কিংবা উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষভাবে উপযোগী।

খাঁচায় মাছ চাষের সুবিধা

- ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ করলে পুকুরের ন্যায় জলাশয়ের প্রয়োজন হয় না।
- প্রবহমান নদীর/খালের পানিকে যথাযথ ব্যবহার করে মাছ উৎপাদন বাড়ানো যায়।
- মাছের বর্জ্য প্রবহমান পানির সাথে অপসারিত হয় বিধায় পানিকে দূষিত করতে পারে না।
- মাছের উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেয়ে নদীর/খালের প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতির প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়।
- প্রবহমান থাকায় প্রতিনিয়ত খাঁচার অভ্যন্তরের পানি পরিবর্তন হতে থাকে ফলে পুকুরের চেয়ে অধিক ঘনত্বে বছরে তিনবার মাছ চাষ করা যায়।
- বন্যার পানিতে মাছ ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
- এ পদ্ধতিতে লবণাক্ত সহিষ্ণু মাছ চাষ করা সম্ভব।
- একই কাঠামো দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।

পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য প্রথমেই খাঁচা তৈরি করতে হয়। লোহার পাইপ কিংবা দণ্ড দিয়ে তৈরি প্রতিটি খাঁচার দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট ও উচ্চতা ৬ ফুট হতে হয়। ভাসমান অবস্থায় খাঁচায় দুই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে খাঁচা স্থাপনের জন্যে খাঁচার মাপের লোহার পাইপ বা দণ্ড অথবা বাঁশের তৈরি হাতলের জাল বেঁধে পানিতে ভাসাতে হয়। তারপর খাঁচার চারকোণায় পাথর বা ভারী কিছু যা পানিতে ডুবে যায় এমন বস্তু যুক্ত করতে হয়। যাতে জালের নিচের অংশ টান টানভাবে পানিতে সমানভাবে সারা বছর কমপক্ষে ৩-৪ মিটার গভীর পানি থাকে এমন স্থানে খাঁচা তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সারিবদ্ধভাবে চারদিকে বাঁশের বনী তৈরি করে সেখানে জালযুক্ত করে জলাশয়ের পাড় থেকে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। যেখানে সারাবছর কমপক্ষে ৩-৪ মিটার গভীর পানি থাকে। আর সেখানে শক্ত খুঁটি দিয়ে খাঁচাগুলো বাঁধতে হবে। তবে খাঁচার মধ্যে লোহা ব্যবহার করলে তা ভাসমান রাখতে প্লাস্টিকের গোলাকার বট ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা শক্ত ড্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

খাঁচা স্থাপনের উপযোগী স্থান

- খাঁচা স্থাপনের জন্য নদীর এমন অংশ উপযোগী যেখানে একমুখী প্রবাহ কিংবা জোয়ার-ভাটার শান্ত প্রবাহ বিদ্যমান। নদীর মূল প্রবাহ যেখানে অত্যধিক তীব্র স্রোত বিদ্যমান সে অঞ্চলে খাঁচা স্থাপন না করাই ভালো। নদীতে প্রতি সেকেন্ডে ৪-৮ ইঞ্চি মাত্রার পানি প্রবাহে খাঁচা স্থাপন মাছের জন্য উপযোগী। তবে প্রবাহের এ মাত্রা সর্বোচ্চ সেকেন্ডে ১৬ ইঞ্চির বেশি না হওয়া উচিত।
- মূল খাঁচা পানিতে ঝুলন্ত রাখার জন্য ন্যূনতম ১০ ফুট গভীরতা থাকা প্রয়োজন। যদিও প্রবহমান পানিতে তলদেশে বর্জ্য জমে গ্যাস দ্বারা খাঁচার মাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম, তথাপি খাঁচার তলদেশ নিচের কাদা থেকে ন্যূনতম ৩ ফুট ব্যবধান থাকা আবশ্যক।
- স্থানটি লোকালয়ের নিকটে হতে হবে যাতে সহজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

- খাঁচা স্থাপনের স্থান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুন্দর হতে হবে যাতে সহজে উৎপাদিত মাছ বাজারজাত করা যায়।
- খাঁচা স্থাপনের কারণে যাতে কোনোভাবেই নৌ চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে এমন স্থান হতে হবে।
- সর্বোপরি খাঁচা স্থাপনের জায়গাটি এমন হতে হবে যাতে শিল্প বা কলকারখানার বর্জ্য কিংবা পয়ঃনিষ্কাশন পানি অথবা কৃষিজমি থেকে বন্যা বা বৃষ্টি বিধৌত কীটনাশক প্রভাবিত পানি নদীতে পতিত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে খাঁচার মাছ মারা যেতে না পারে।

খাঁচায় চাষ উপযোগী মৎস্য প্রজাতি

খাঁচায় মাছ চাষ পুকুরে মাছ চাষের চেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানে পুকুরের চেয়ে অনেক বেশি ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হয়। খাঁচার মাছ শুধু বাহির থেকে সরবরাহকৃত সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই পুকুরের ন্যায় বিস্তৃত পরিবেশে প্রাকৃতিক খাদ্যের জন্য বিচরণ করতে পারে না। আবদ্ধ পরিবেশে থাকার কারণে আক্রমণাত্মক স্বভাবের কোনো মাছ চাষ করা যায় না। দুর্বল প্রজাতির কোনো মাছ নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে না। আবার, ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত মাছগুলো নাড়াচাড়া করে স্থানান্তর করতে হয়। এ ধরনের ব্যবস্থাপনার পীড়ন সহ্য ক্ষমতা না থাকলে মাছ মারা যেতে পারে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ কোনো কারণে ব্যাহত হলে কিংবা তলার বর্জ্য পদার্থের প্রত্যাশিত অপসারণ না হলে খাঁচার পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করেই বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ ভৌগোলিক এলাকায় সহজলভ্য প্রজাতির মাছই খাঁচার জন্য নির্বাচন করা হয়। সাধারণভাবে খাঁচায় মৎস্য প্রজাতি চাষের জন্য নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা হয়:

- নিজস্ব প্রতিবেশে স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত মাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার ভালো।
- অধিক ঘনত্বে বসবাস উপযোগী।
- যে মাছের পোনা সবসময়ই সহজলভ্য।
- যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।
- সম্পূরক খাদ্যে সাড়া দেওয়ার প্রবণতা ভালো।
- খাঁচায় লাফানোর প্রবণতা কম।
- তুলনামূলকভাবে দৈহিক পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা বেশি।
- স্থানীয় বাজারে ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও মূল্য বেশি।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনায় দক্ষিণাঞ্চলে খাঁচায় চাষের উপযোগী উত্তম প্রজাতি হিসেবে নিম্নলিখিত মাছগুলোকে নির্বাচন করা হয়:

- তেলাপিয়া
- কৈ
- ভেট্‌কি
- গ্রাসকার্প
- কমনকার্প
- শোল
- সরপুঁটি ইত্যাদি।

খাঁচার আকার

খাঁচা তৈরির জন্য এমন জাল ব্যবহার করতে হবে যেন কাঁকড়া, গুঁইসাপ, কচ্ছপ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী জালগুলো কাটতে না পারে। ডাকাতিয়া মডেলের খাঁচার জন্য সাধারণত দুই আকারের জাল তৈরি করা হয়, যেমন: ২০ ফুট x ১০ ফুট X ৬ ফুট এবং ১০ ফুট X ১০ ফুট X ৬ ফুট। খাঁচা তৈরির জন্য জালগুলো মেস ৩/৪ ইঞ্চি থেকে ১১/৪ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া ভালো। এতে সহজে নদীর পরিস্কার পানি প্রতিনিয়ত খাঁচার ভিতরে সঞ্চালিত হতে পারে।

ফ্রেম তৈরি ও স্থাপন

১ ইঞ্চি জিআই পাইপ দ্বারা আয়তকার ২০ ফুট X ১০ ফুট ফ্রেমের খাঁচাগুলো তৈরি করা হয়। আর মাঝে ১০ ফুট আরেকটি পাইপ বসিয়ে ঝালাই করে ফ্রেম তৈরি করা হয়। এতে একটি ফ্রেমে সরাসরি ২০ ফুট X ১০ ফুট আকারের খাঁচা বসানো যায়। আবার প্রয়োজনবোধে ১০ ফুট X ১০ ফুট আকারের দু'টি খাঁচাও বসানো যায়। প্রতি দুই ফ্রেমের মাঝে ৩টি ড্রাম স্থাপন করে সারিবদ্ধভাবে ফ্রেমগুলো স্থাপন করা হয়। প্রয়োজনীয়সংখ্যক গেরাপি বা নোঙর দিয়ে খাঁচা নদীর নির্দিষ্ট স্থানে শক্তভাবে বসানো হয়। এরপর প্রতিটি ফ্রেমের সাথে পৃথক পৃথক জাল সেট করা হয়।

পোনা মজুদ ও উৎপাদন

পাঁচ-ছয় মাসের ব্যবধানেই খাঁচা থেকে মাছ আহরণ ও বিক্রয় করা যায়। আর ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে দেশেই বিভিন্ন হ্যাচারিতে মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে । এর সাথে সাথে আরও কিছু প্রজাতির মাছের পোনা খাঁচায় মজুদ করে উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশি কৈ, শোল,শিং, মাগুর মাছও খাঁচায় চাষ করা সম্ভব; তবে এ সকল মাছের পোনা প্রাপ্তিই প্রধান প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়। পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা গেলে ও উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার সহজলভ্য হলে ব্যাপকভাবে খাঁচায় এ সকল প্রজাতির মাছ চাষ সম্ভব হবে।

পানির স্রোত, জালের ফাঁসের আকার, পানির গভীরতা, প্রত্যাশিত আকারের মাছ উৎপাদন, খাদ্যের গুণগতমান এবং বিনিয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করেই মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। স্থাপিত খাঁচায় মাছের প্রজাতিভেদে যেমন প্রতি ঘনমিটারে ৩০ থেকে ৪০টি পর্যন্ত মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা মজুত করা যাবে। মজুদকালে পোনার আকার এমন হতে হবে যাতে জালের মেসের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। ন্যূনতম ২৫-৩০ গ্রাম আকারের পোনা মজুত করতে হবে।

খাদ্য

খাঁচায় তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্যে শতকরা ২৮ থেকে ৩০ ভাগ প্রোটিন থাকতে হয়। কারখানায় উৎপাদিত বা চাষি নিয়ম মেনে নিজেই এ খাদ্য তৈরি করে ব্যবহার করতে পারে। তবে সব ধরনের খাবার অবশ্যই ভাসমান হতে হয় । কারণ ডুবন্ত খাবার জালের নিচ দিয়ে জলাশয়ে পড়ে যায় এতে জালের নিচের অংশে খাবার পচে রোগ তৈরি হতে পারে। তাই গবেষকরা এক্ষেত্রে ভাসমানজাতীয় খাবার দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে চাহিদা বুঝে দৈনিক দুই থেকে তিনবার খাবার প্রয়োগ করলে উৎপাদনে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

খাঁচায় মাছ বাছাইকরণ

সাধারণত প্রত্যাশিত উৎপাদনের জন্য খাঁচায় পোনা মজুদের তিন সপ্তাহ পর প্রথমবার খাঁচার মাছ বাছাই করতে হবে (তবে জাতভেদে ভিন্ন সময় হতে পারে)। দিনের তাপমাত্রার দিকে লক্ষ রেখে সকাল বেলা কিংবা পড়ন্ত বিকেলে খাঁচার মাছ বাছাই করা উচিত। যখন নদীর পানি বেশি প্রবহমান থাকে তখন খাঁচার পানি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। এ সময় খাঁচার মাছ বাছাই করা অধিক উপযোগী। বাজারজাত করার পূর্বে প্রয়োজন অনুসারে দুই তিনবার বাছাই করতে হবে।

মাছ আহরণ

সাধারণ জলাশয় বা পুকুরের মতো খাঁচায় চাষকৃত মাছ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না। তবে এক্ষেত্রে হাত জাল দিয়ে খুব সহজেই মাছ ধরা যায়। এছাড়া অন্যান্য মাছ ধরার সহজ ফাঁদও ব্যবহার করা যায়। এতে করে চাষিকে মাছ সংগ্রহের জন্যে আলাদা খরচের প্রয়োজন পড়ে না।

বর্তমান বাজারমূল্যে ৫০টি খাঁচা স্থাপনের জন্য স্থায়ী খরচ

ক্রম	উপকরণের নাম	পরিমাণ/সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১.	সেলাই করা জাল	৫০টি	৩৫০০.০০	১৭৫০০০.০০
২.	খালি বা শূন্য ড্রাম/ব্যারেল	১৫৩টি	১৪৫০.০০	২২১৮৫০.০০
৩.	১ ইঞ্চি জিআই পাইপ	৩৬০০ ফুট	৮০.০০	২৮৮০০০.০০
৪.	ফ্রেমের সংযোগ লৌহ	৩৫০টি	১০০.০০	৩৫০০০.০০
৫.	গেরাপি (অ্যাঙ্কর)	১২টি (২০ কেজি প্রতিটি)	২৪০০.০০	২৮৮০০.০০
৬.	গেরাপি বাঁধার কাছি	৫ কয়েল	৫০০০.০০	২৫০০০.০০
৭.	বাঁশ	১০০ টি	২০০.০০	২০০০০.০০
৮.	নাইলনের সুতা ও রশি	৫০০০.০০ টাকা		৫০০০.০০

৫০ টি খাঁচার এক ফসলের উৎপাদন খরচ

ক্রম	উপকরণের নাম	পরিমাণ/সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১.	মাছের পোনা সংগ্রহ	৬০০০০	২.০০	১২০০০০.০০
২.	মাছের খাদ্য	২৪৫০০ কেজি	২৮.০০	৬৮৬০০০.০০
৩.	শ্রমিক খরচ ছয় মাসের জন্য ৩ জন (১৮ শ্রম মাস)		৩০০০.০০	৫৪০০০.০০
				মোট: ৮৬০০০০.০০

মাছের উৎপাদন (মনোসেক্স তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে)

প্রতিটি খাঁচায় একটি ফসলে সর্বনিম্ন উৎপাদন	= ৩৫০ কেজি
৫০টি খাঁচায় (৩৫০X৫০)	= ১৭৫০০ কেজি
প্রতি কেজি মাছের পাইকারি বাজারমূল্য	= ১০০.০০ টাকা
মোট মাছ বিক্রয়	= ১৭৫০০০০.০০ টাকা
নিট লাভ = (১৭৫০০০০.০০-৮৬০০০০.০০)	= ৮৯০০০০.০০ টাকা

আমাদের দেশে প্রচুর উপযোগী নদী রয়েছে। সারা বছর খাঁচায় মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। আমাদের দেশে এবং বিদেশে তেলাপিয়া মাছের প্রচুর চাহিদা আছে। উপকূলে বসবাসরত জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র জেলেগোষ্ঠী শুধু নদী থেকে প্রাকৃতিক মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব মৎস্যজীবীকে সংগঠিত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব, সেই সাথে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ করে নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতিগুলোর প্রজনন মৌসুমে তাদের নিবৃত করে নদীর প্রাকৃতিক মাছের মজুদ বাড়ানো ও বিভিন্ন মাছের প্রজাতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও খাঁচায় উৎপাদিত মানসম্পন্ন তেলাপিয়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তেলাপিয়া বাজারে প্রবেশের জন্য নীতিনির্ধারণী মহলসহ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকলের এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

১. খাঁচায়মাছ-চাষ-কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২. ভাসমান খাঁচায় নদীতে মৎস্য চাষপদ্ধতি। খাঁচায় মাছ চাষের সুবিধা:
http://www.agriculturelearning.com/%E0%A6%AE%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E 0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-2/

৩. খাচায় মাছ চাষপদ্ধতি ও করনীয় :
https://akkbd.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A 7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%
A6%9B-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7/

কাঁকড়ার গ্রেডিং নির্ণয়ে ওরিয়েন্টেশন

কাঁকড়ার গ্রেডিং ও বাজারজাতকরণ

স্ত্রী কাঁকড়ার ডিম্বাশয় পরিপক্ব এবং পুরুষ কাঁকড়ার দেহের খোলস শক্ত হলে বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়। লিঙ্গ এবং ওজন অনুযায়ী গ্রেডিং করে পৃথকভাবে বাঁশের বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ভরে বাজারজাত করা হয়। নিচের টেবিলে কাঁকড়ার গ্রেডিং-সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হলো :

স্ত্রী কাঁকড়া

গ্রেড	F1	KS-1	F2	F3	F4
ওজ ন (গ্রাম)	>১৮০	>১৮০	১৫০ - <১৮০	১২০ -< ১৫০	<১২০
বাজারমূল্য (টাকা)	২৫০ -১০০০	১০০ -৩৫০	২০০ -৫০০	১৫০ -৫০০	১০০ -৩০০

পুরুষ কাঁকড়া

গ্রেড	XXL	XL	L	M	SM
ওজন (গ্রাম)	> ৫০০	> ৪০০	> ৩০০	> ২০০	> ১০০
বাজারমূল্য (টাকা)	২৫০ -৮০০	২০০ -৬৫০	১৫০ -৪৫০	১০০ -৩৫০	৫০ -২০০

তথ্যসূত্র

Mud Crab aquaculture A practical manual: ACADEMIA
Description of mud crab (Scylla spp.) culture methods in Vietnam : ACADEMIA
Technical guidelin e of Crab culture: SDC Shomoshti project, CARE Bangladesh

রুই জাতীয় মাছের নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের চিরাচরিত ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন দিন দিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে মাছের বৃদ্ধি, চাষ, প্রজনন ও বিচরণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনাবৃষ্টি, অপর্যাপ্ত বৃষ্টির ফলে দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খরা দেখা দিচ্ছে, যা মাছের প্রজননের জন্য প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে চলেছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মাছের জন্য অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে, দিনে দিনে উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ আহরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, স্বল্পমেয়াদি মাছ চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও চাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য স্বল্প পানিতে এবং বেশি তাপমাত্রায় টিকে থাকতে সক্ষম এমন ধরনের প্রজাতিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য চাষাবাদ পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনা প্রয়োজন। রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নার্সারি ব্যবস্থাপনা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। মৎস্য হ্যাচারি থেকে রুইজাতীয় মাছের রেণু পোনা নিয়ে এসে মে-জুলাই মাসে নার্সারি পুকুরে লালন-পালন (নার্সিং) করে আঙুল (৩-৪ ইঞ্চি) আকারের পোনা উৎপাদন করে বিক্রি করলে চাষিরা বেশ লাভবান হতে পারে। নার্সারিতে উৎপাদিত পোনা বর্ষা মৌসুমে পুকুরে চাষাবাদ করে চাষিরা আরও লাভবান হতে পারে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রুইজাতীয় মাছের নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনা

রুই (কার্পজাতীয় মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য নার্সারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নার্সারি পুকুর এবং রেণু পোনার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাস্তব দক্ষতাসম্পন্ন জ্ঞান না হলে পোনা উৎপাদন সম্ভব নয়। লাভজনক নার্সারি পরিচালনা করার জন্য দক্ষতা অত্যাবশ্যক। মাছ চাষের ক্ষেত্রে রেণু পোনাকে ছোট জলাশয়ে প্রতিপালন করে অপেক্ষাকৃত বড় জলাশয়ে বা পুকুরে ছেড়ে মাছ চাষ করা হয়। যে সকল ছোট পুকুরে বা জলাশয়ে রেণু পোনা বা ধানী পোনা অতি যত্নসহকারে পালন করা হয় তাকে আঁতুর পুকুর বা নার্সারি পুকুর বলে।

মাছের রেণু বা ধানী পোনা প্রয়োজনীয় পরিচর্যার মাধ্যমে লালন-পালন করে মজুদ পুকুরে ছেড়ে চারা পোনায় উন্নীত করার পদ্ধতিকে নার্সারি ব্যবস্থাপনা বলে। অর্থনৈতিক দিক থেকে নার্সারি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনায় উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। ৩-৫ দিনের রেণু ছেড়ে ৩-৪ ইঞ্চি পোনা উৎপাদন করাকে নার্সারি বলে।

পোনা চাষে নার্সারি পুকুরের বৈশিষ্ট্যঃ যেকোনো অগভীর, বাৎসরিক বা মৌসুমি পুকুরকে মাছের পোনা প্রতিপালনের জন্য আঁতুর পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে আঁতুর পুকুর ছোট হওয়া ভালো।

নার্সারি পুকুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- পুকুরটি খোলামেলা স্থানে হবে;
- ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা থাকবে;
- উত্তর- দক্ষিণ লম্বা হলে ভালো হয়;
- পুকুরের আয়তন ১০-২৫ শতাংশ হবে;
- পানির গভীরতা ২.৫- ৩ ফুট হবে;
- দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ বা এঁটেল-দো-আঁশ মাটি নার্সারি পুকুরের জন্য উত্তম;
- তলদেশে কাদার পরিমাণ কম থাকা;
- জলজ আগাছা না থাকা;
- বন্যামুক্ত শক্ত ও উঁচু পাড়;
- পাড়ে ঝোপ-ঝাড় না থাকা;
- পানি নিষ্কাশন ও সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা।

নার্সারি ব্যবস্থাপনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: ক) আঁতুর পুকুর ব্যবস্থাপনা; খ) কাটাই বা লালন পুকুর ব্যবস্থাপনা। এখানে আঁতুর পুকুর ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হলো:

ক) আঁতুর পুকুর ব্যবস্থাপনা: আঁতুর পুকুরে সাধারণত ৩-৪ দিনের ধানী পোনা এনে ১০-১৫ দিন লালন-পালন করা হয়। পুকুরে সঠিক ব্যবস্থাপনার উপর মাছের পোনার বাঁচার হার এবং বৃদ্ধি নির্ভর করে।

১) আগাছা ও পাড় পরিস্কার: মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র মাসে নার্সারি পুকুর পাড়ের আগাছা ও ঝোপঝাড় পরিস্কার করতে হবে। ফলে-,

- পুকুরে বেশি আলো পড়ে।
- পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য বেশি তৈরি হয়।
- পোনা উৎপাদন বেশি হয়।

২) পুকুর পাড় মেরামত ও সংস্কার

প্রতিবছর নার্সারি পুকুরের পানি শুকানো উত্তম। পানি শুকানোর পর ভাঙা পাড় উঁচু, মজবুত এবং ছিদ্রবিহীনভাবে মেরামত করতে হবে। পুকুরের তলার অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলে অসমান তলদেশ সমান করতে হবে। পানি শুকানোর পর তলায় চাষ দিতে হবে। পুকুর পাড়ের ঢাল ১ঃ২ হতে হবে।

পুকুরে পোনা অবমুক্তকরণ

পুকুরের পাড় ও তলা সংস্কারের উপকারিতা

- মাটি চাষ দিলে মাটির বাঁধন আলগা হয় তাতে সূর্যের আলো মাটির গভীরে প্রবেশ করার ফলে রোগ জীবাণু মারা যায় এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে ।
- পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ ভালো থাকে।
- তলার বিষাক্ত গ্যাস দূর হয়।
- পোনা মাছ আহরণের সময় জাল টানা সহজ হয়।
- পুকুরের পাড় মেরামত ও উঁচু হলে রেণু পোনার চাষ এবং পরিচর্যা সহজ হয়।
- বাইরের দূষিত পানি পুকুরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।
- বাইরের রাক্ষুসে ও অন্য প্রজাতির মাছ পুকুরে ঢুকতে পারবে না।

৩) জলজ আগাছা দমন: পুকুরে ভাসমান, ডুবন্ত নানা জাতের আগাছা ও শেওলা তুলে ফেলা দরকার। কারণ ভাসমান, ডুবন্ত আগাছা ও শেওলা-

- মাছের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে।
- মাটি ও পানির পুষ্টিকর উপাদান ব্যবহারের কারণে মাছের খাদ্য তৈরিতে বাধার সৃষ্টি হয়।
- নার্সারি পুকুরে অতিরিক্ত তন্তাজাতীয় শেওলা থাকলে পোনা আহরণের সময় তন্তাজাতীয় শেওলায় আটকে পোনা মারা যায়।

আগাছা দমনের উপায়

- কায়িক শ্রম দ্বারা আগাছা দূর করা যায়।
- প্রতি শতাংশে ৮-১০ গ্রাম তুঁত (কপার সালফেট) পানিতে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিলে ৩-৪ দিনের মধ্যে সমস্ত শেওলা মারা যায়।

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা

- পানিতে সরাসরি আলো পড়ে ফলে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- পোনা মাছের জন্য ক্ষতিকারক জীবাণু ও প্রাণী আগাছার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে না।
- পোনা মাছের চলাচল সহজ হয় এবং জাল টানতে সুবিধা হয়।
- খাদ্য প্রয়োগে সুবিধা হয়।

৪) রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূরীকরণ: রাক্ষুসে মাছ চাষকৃত মাছের রেণু/পোনা খেয়ে ফেলে। অচাষকৃত মাছ চাষকৃত মাছের রেণু/পোনার খাবার খেয়ে ফেলে। তাই নার্সারি পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ যেমন: শোল, টাকি, গজার, বোয়াল, ফলি, চান্দা, পুঁটি, মলা, চেলা, শিং, মাগুর, কৈসহ যেকোনো ধরনের রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূর করতে হবে। মাছের রেণু পোনা ছাড়ার আগেই পুকুর শুকিয়ে বারবার জাল টেনে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ পুকুর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূরীকরণের উপকারিতা

- সুস্থ সবল রেণুর বাঁচার হার বেশি।
- মাছের পোনার বৃদ্ধির হার বাড়ে।
- প্রাকৃতিক ও সম্পূরক খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- মাছের রোগ-বালাই হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
- পোনার উৎপাদন বেশি হয়।

রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ পুকুর থেকে দূরীকরণের উপায়

পুকুর শুকিয়ে: নার্সারি পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূরীকরণের সর্বোত্তম উপায় হলো শ্যালো মেশিন দিয়ে পুকুর সেচে শুকিয়ে ফেলা। পুকুর শুকানোর পর তলায় প্রয়োজনে চাষ দেওয়া এবং কড়া রোদে বেশ কিছুদিন (১৫ দিন) পুকুর ফেলে রাখা প্রয়োজন। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পুকুর শুকিয়ে ফেলা উত্তম। এতে খরচ ও সময় দুইই কম লাগে।

বারবার জাল টেনে: পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে ঘন ফাঁসের জাল বারবার টেনে রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূর করা যায়। রোটেনন পাউডার প্রয়োগ করে পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূর করা যায়। প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির গভীরতার জন্য ৯.১ মাত্রার ২৫-৩০ গ্রাম রোটেনন প্রয়োজন। কড়া রোদে সকাল ১০-১১ টার সময় প্রয়োগ করলে রোটেননের কার্যকারিতা বেশি পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় মোট রোটেননের তিন ভাগের এক ভাগ কাই তৈরি করে ছোট ছোট বল করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং বল ছিটানোর পর পরই বাকি দুই ভাগ বেশি পরিমাণ পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। প্রায় ২০-৩০ মিনিট পর মাছ আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে জাল টেনে সমস্ত মাছ ধরে ফেলতে হবে। জাল টেনে পুকুরের পানি উলোট-পালট করে দিলে বিষের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। রোটেননের বিষাক্ততার মেয়াদ ৬-৭ দিন থাকে। এই রোটেনন পাউডার দিয়ে মরা মাছ খেলে কোনো অসুবিধা হয় না।

রোটেন প্রয়োগের সতর্কতা

- রোটেনন গুলানো ও প্রয়োগের সময় হাতে পলিথিন ও নাকে মুখে গামছা বেঁধে নিতে হবে।
- রোটেনন বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।
- রোটেনন প্রয়োগের পর হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুতে হবে এবং পাত্রগুলো ভালোভাবে পরিস্কার করতে হবে।
- রোটেনন সবসময় বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- রোটেনন বৃষ্টির দিনে কিংবা মেঘলা সময়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে না।

মৎস্য উপকারভোগী দলের সভা

৫) পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগঃ পুকুরের তলদেশের মাটি শুকিয়ে গেলে তলদেশে লাঙল দিয়ে ভালোভাবে চাষ করে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে পোড়াচুন পাড়সহ সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় পুকুরের তলদেশের পরজীবী প্রাণী মারা যায় এবং পুকুরের পানি কিছুটা ক্ষারযুক্ত হয়। এছাড়াও মাটি থেকে পুষ্টিকর পদার্থ মুক্ত হয়ে পোনা মাছের খাবার উৎপাদনে সহায়তা করে। সন্ধ্যারাতে মাটির চাড়ি বা ড্রামে তিন গুণ পানিতে চুন ভিজিয়ে রাখতে হবে। ঠান্ডা হওয়ার পর আরও পানি মিশিয়ে পানিভর্তি পুকুরের ক্ষেত্রে পুকুরের ঢালসহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন প্রয়োগের ৩ দিন পরে পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। যদি পানি নিষ্কাশন না করে রোটেনন প্রয়োগ করা হয় তাহলে রোটেনন প্রয়োগের ৩-৫ দিন পর চুন দিতে হবে।

চুন ব্যবহারের মাত্রাঃ পানির পিএইচ (৩-৫ হলে চুন ৬ কেজি, পিএইচ ৫-৬ হলে চুন ৪ কেজি, পিএইচ ৬-৭ হলে প্রতি শতাংশে ২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতি তিন মাস পরপর চুন প্রয়োগ করলে পুকুরে স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় থাকে। এক্ষেত্রে চুনের মাত্রা হবে প্রাথমিক মাত্রার ১/৪ ভাগ থেকে ১/২ ভাগ।

ভালো চুন শনাক্তকরণের উপায়ঃ একটি কাচের গ্লাসে কিছু পরিমাণ পানি নিয়ে তাতে এক টুকরা চুন দিয়ে পরীক্ষা করা যায়। ভালো চুন বিক্রিয়া করে পানিতে বুদবুদ ও তাপ সৃষ্টি করে। চুন কেনার সময় বাজারে বসে চায়ের কাপে বা গ্লাসে চুন ও পানি নিয়ে ভালো চুন শনাক্ত করা যায়।

৬) পানি প্রবেশঃ পুকুর শুকানো হলে চুন প্রয়োগের ২-৩ দিন পর পুকুরে পানি প্রবেশ করাতে হবে। পুকুরে পানি ভরানোর ক্ষেত্রে গভীর নলকূপ বা অগভীর নলকূপ দ্বারা মাটির নিচের পানি প্রবেশ করানো ভালো। যদি পুকুর বা অন্য ডোবা থেকে পানি প্রবেশ করানো হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফিল্টার নেট দিয়ে পানি ছেঁকে প্রবেশ করাতে হবে যেন পুকুরে কোনো রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ ঢুকতে না পারে।

৭) পুকুর প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগঃ পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানোর জন্য জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের ফলে পুকুরে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণিজাতীয় জীবকণা জন্ম নেয় যা খেয়ে রেণু জীবনধারণ করে। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণিজাতীয় জীবকণাগুলোকে বলা হয় প্ল্যাঙ্কটন। শুকনো পুকুরে প্রয়োজনীয় জৈব সার সমস্ত পুকুরের ছিটানোর পর চাষ দিয়ে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার হিসেবে খৈলও ব্যবহার করা যেতে পারে। শতাংশ প্রতি আধা কেজি (০.৫০ কেজি) খৈল রটিফার (প্রাণিকণা) উৎপাদনে সহায়ক। অজৈব সার পুকুরে পানি ভরাটের পর একত্রে গুলিয়ে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগের ১-২ দিন পর এবং রেণুপোনা মজুদের কমপক্ষে ৪-৫ দিন আগে সার প্রয়োগ করতে হবে। সূর্যালোকিত সকাল ৯-১০ টার সময় সার প্রয়োগ করা ভালো। এতে পানিতে পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত হয়। মাছের বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করে। দ্রুত প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য খৈল ৩০০-৪০০ গ্রাম/শতাংশ এবং ইউরিয়া ৮০-১০০ গ্রাম/শতাংশ প্রয়োগ করতে হবে। (খৈল ও ইউরিয়া) একটি পাত্রে তিন গুণ পানির সাথে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সূর্যের আলোতে সকাল ১০-১১ টায় সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সারের নাম	সারের ধরন	প্রয়োগ মাত্রা (প্রতি শতাংশে)	প্রয়োগ পদ্ধতি
জৈব সার	গোবর বা কম্পোস্ট	৬-১০ কেজি	**শুকনো পুকুরঃ** প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব সার সমানভাবে পুকুরের তলায় ছিটিয়ে দেওয়ার পর চাষ দিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। **পানিভর্তি পুকুরঃ** পরিমাণমতো গোবর পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
অজৈব সার	ইউরিয়া	৭৫-১০০ গ্রাম	টিএসপি রাতে পানিতে ভিজিয়ে পরের দিন সূর্যালোকিত সকালে (৯ -১০টা) ইউরিয়ার সাথে মিশিয়ে পুকুরের গভীর অংশে ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
	টিএসপি	৭৫-১০০ গ্রাম	
	এমওপি	২৫-৫০ কেজি	

৮) প্রাকৃতিক খাদ্য ও প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা: রেণু মজুদের পূর্বেই পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। পুকুরে সার দেওয়ার ৩-৪ দিনের মধ্যেই মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। পানির রং লালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ হলে বোঝা যায় পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে। সার দেওয়ার ৪-৫ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরীক্ষা করতে হবে। কারণ পোনা মাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে আসে।
সার ও খৈল দিলে পুকুরে উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা জন্ম নেয়। পানির বর্ণ দেখে বোঝা যায় প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি। যেমন: প্রাকৃতিক খাদ্যযুক্ত পানির বর্ণ হালকা সবুজ, বাদামি সবুজ, বা হালকা বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক খাদ্য ২ ধরনের হয়: ক) উদ্ভিদ কণা খ) প্রাণিকণা।

৯) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা: পানিতে বিষক্রিয়া থাকলে রেণু মারা যাবে। তাই পুকুরে রেণু ছাড়ার ১-২ দিন আগে পুকুরের পানিতে একটি হাপা টাঙিয়ে বা পাতিলের পানিতে ১০-১৫ টি পোনা ছেড়ে ৭-৮ ঘণ্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে পোনাগুলো মারা যায় কিনা। যদি পোনা মারা না যায় তবে বুঝতে হবে যে, পুকুরের পানিতে বিষাক্ততা নেই। পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে যে, পানি বিষাক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

১০) ক্ষতিকর জলজ কীটপতঙ্গ দমন: নার্সারি পুকুরে সার প্রয়োগের ৩-৪ দিনের মধ্যেই পানির বর্ণ সবুজ হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা (প্ল্যাঙ্কটন) ও অন্যান্য ক্ষতিকর পোকামাকড় যেমন: হাঁসপোকা,ব্যাঙাচী, বড় প্রাণিকণা (মাখন পোকা) ইত্যাদি জন্মায়। ক্ষতিকর পোকামাকড় মাছের রেণুপোনা খেয়ে ফেলে অথবা পেট কেটে মেরে ফেলে। খাদ্যের জন্য রেণুর সাথে প্রতিযোগিতা করে। ফলে রেণুর মড়ক বেশি হয়। রেণু ছাড়ার আগে ও পরে এদের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

রেণু পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা
প্রজাতি নির্বাচন: নার্সারি পুকুরে একক প্রজাতির রেণু চাষ করা উত্তম। নার্সারিতে ভালো মানের পোনা উৎপাদন এবং মুনাফা অর্জনকে সামনে রেখে প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। যেমন: নির্বাচিত প্রজাতির রেণু এলাকাভিত্তিক প্রাপ্যতা, চারা পোনার এলাকাভিত্তিক চাহিদা, পুকুরের ধরন ও আকার, চাষের ধরন, চাষির অভিজ্ঞতা, চাষির আর্থিক সংগতি ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে আমাদের দেশে সাধারণত রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, মিরর কার্প, বিগহেড কার্প, রাজপুঁটি/থাই পুঁটি, কমন কার্প, পাঙ্গাস, থাই কৈ, ভিয়েতনামী কৈ, শিং, মাগুর ও মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা নার্সারিতে চাষ করা হয়ে থাকে।

পোনার পরিচিত

ডিম পোনা: ডিম ফোটার পর ২-৩ দিন পর্যন্ত পেটে একটি থলি থাকে। বাইরের খাবার খায় না।

রেণু পোনা: পেটের থলি শেষ হওয়ার পরের অবস্থা। দেখতে মশার বাচ্চার মতো। সিদ্ধ ডিমের কুসুম, ভাসমান ছোট কীট, ময়দা, খৈল ও মিহি কুঁড়া খেতে পারে।

ধানী পোনা: এ ধরনের পোনার আকার এক আঙুলের ৩ ভাগের এক ভাগ বা ১ ইঞ্চির মতো হয়। ধানী পোনা ভাসমান ছোট কীট, শেওলা কণা এবং খৈল কুঁড়া খেতে পারে। রেণু থেকে ধানী পোনা হতে ৮-১০ দিন সময় লাগে।

চারা পোনা: আঙুলের মতো বা আরও বড় (৭-১৫ সেমি) বা ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি হয়। ধানী পোনা থেকে চারা পোনা হতে ৪০-৬০ দিন সময় লাগে। চাষের জন্য চারা পোনাই মজুদ করা হয়।

জলবায়ু সহনশীল মৎস্য প্রশিক্ষণ

প্রজাতি অনুযায়ী প্রতি গ্রামে রেণুর সংখ্যা নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	প্রজাতি	রেণুর গড় সংখ্যা/গ্রাম
০১	কাতলা	৪০০ টি
০২	রুই	৪৭৫ টি
০৩	মৃগেল	৪০০ টি
০৪	সিলভার কার্প	৩২৫-৪০০ টি
০৫	গ্রাস কার্প	৪৫০ টি
০৬	মিরর কার্প	৪৫০ টি
০৭	বিগহেড	৩০০ টি
০৮	থাই সরপুঁটি/রাজপুঁটি	৭০০-৮০০ টি

রেণু পোনার মজুদ ঘনত্বঃ প্রস্তুতকৃত নার্সারি পুকুরে ৩-৫ দিন বয়সের রেণু পোনা প্রতি শতাংশে ৪০-৫০ গ্রাম করে মজুদ করা যায়। প্রথমে অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুরে রেণু ছেড়ে ১০-১৫ দিন লালন করা হয়। রেণু পোনা ধানী পোনায় পরিণত হলে সেগুলো অন্য পুকুরে নিয়ে লালন করে কাটাই করতে হবে। নার্সারি পুকুরে এক সাথে একক প্রজাতির রেণু মজুদ করা ভালো। একের অধিক প্রজাতির রেণু এক সাথে মজুদ করলে ভালো ফল পাওয়া যায় না।

রেণু পোনা আঁতুর পুকুরের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো ও পুকুরের মজুদকরণঃ পুকুরে ছাড়ার আগে রেণু পোনাকে আঁতুর পুকুরের নতুন পরিবেশের সাথে সহনশীল করে নিলে মৃত্যু হার অনেকাংশে রোধ করা যায়। এজন্য-

- প্রথমে রেণু পরিবহনকৃত ব্যাগ বা পাত্রটি পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে।
- তারপর মুখ খুলে হাত দ্বারা পরিবহন ব্যাগের বা পাত্রের পানি আস্তে আস্তে অদল-বদল করতে হবে।
- পুকুর এবং ব্যাগের পানির তাপমাত্রায় সমতা আসলে ব্যাগটি কাত করে ধরে আলতোভাবে ঢেউ দিয়ে মৃদু স্রোতের ব্যবস্থা করলে সুস্থ-সবল রেণু স্রোতের বিপরীতে ব্যাগ থেকে ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। এ কাজটি ২৫-৩০ মিনিট সময় ধরে করতে হবে।

উপসংহার

সুস্থ সবল পোনা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ভালো মানের নার্সারি। রেণু পোনা খুবই সংবেদনশীল। তাই নার্সারি পুকুর যদি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা না হয় তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে বাড়ির আশেপাশে ছোট এবং মাঝারি আকারের অসংখ্য পুকুর রয়েছে। এসব পুকুর যদি চাষের আওতায় নিয়ে চাষ করা হয় তাহলে বিভিন্ন এলাকায় ভালো মানের পোনার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। এর ফলে গ্রামীণ বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান, চাষিদের আয় বাড়ানো, মজুদ পুকুরে ভালো মানের পোনার চাহিদা পূরণ, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, পারিবারিক শ্রম ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। আমাদের দেশের ছোট-মাঝারি পুকুরগুলো রেণু পোনা চাষের আওতায় আনলে মৎস্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালন

বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৯টি জেলায় প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ বাস করেন। এদের অধিকাংশই চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী; যারা বেড়িবাঁধ/সরকারি আবাসনে বসবাস করে। তাদের অধিকাংশেরই নিজস্ব চাষযোগ্য কোনো জমি নেই। ফলে তারা জেলে/কৃষি শ্রমিক হিসেবে অন্যের জমিতে কাজ করেন। এসব পরিবারের নারীরা পারিবারিক পর্যায়ে খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করলে তাদের অভাব-অনাটন অনেকাংশে দূর করা সম্ভব।

খাকি ক্যাম্পবেল হাঁসের পরিচয়

১৯০১ - ১৯০৫ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের চেরিভ্যালি ডাক ফার্মে মিসেস ক্যাম্পবেল ইন্ডায়ান রানার ও রোয়েন জাতের মধ্যে ক্রস করে এই জাতটি তৈরি করেন। তার নাম অনুসারে জাতটির নামকরণ করা হয় খাকি ক্যাম্পবেল। এটি ডিম উৎপাদনকারী জাত হিসেবে পরিচিত। এই হাঁস যেকোনো আবহাওয়ায় পালন করা যায়।

একটি খাকি ক্যাম্পবেল পুরুষ হাঁসের ওজন (হাঁসা) ২.৫ কেজি এবং স্ত্রী হাঁসের (হাঁসী) ২ থেকে ২.২৫ কেজি হয়ে থাকে। ইংল্যান্ডে এদের ডিম উৎপাদনের রেকর্ড ৩৬৪ টি। অন্যান্য দেশে ২৮০ থেকে ৩০০ টি ডিম পাড়ে। এই হাঁস তার দৈহিক ওজনের ২৫ গুণ পর্যন্ত ডিম পাড়ে এবং ডিমের রং সাদা হয়।

খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালনের সুবিধা

- দেশি হাঁসের তুলনায় দ্রুত বড় হয় ও ডিম পাড়া শুরু করে।
- দেশি হাঁসের চেয়ে বড় এবং বেশি ডিম পাড়ে বছরে।
- রোগ কম হয়।
- এ হাঁসের ঘর পরিপাটি না হলেও চলে।
- দেশি হাঁসের তুলনায় এ হাঁসের কুড়িয়ে খাওয়ার দক্ষতা বেশি এবং হাঁস ডাঙা ও পানি উভয় স্থানের খাবার খেতে পারে।
- পোকামাকড় কীটপতঙ্গ ইত্যাদি যা মানুষের রোগ ছড়ায় সেগুলো খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে।
- হাঁসের ডিমে মুরগির ডিমের তুলনায় পুষ্টিমান বেশি।
- দেশি হাঁসের মতো হাঁসের যত্ন নিলেই হয়।

উপকূলীয় এলাকায় এই হাঁসের উপযোগিতা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় রয়েছে বিশাল জলরাশি সাথে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ডোবা যা হাঁস পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কারণ এতে রয়েছে শামুক-ঝিনুক, কীট-পতঙ্গ, ছোট মাছ যা হাঁসের খাদ্যের একটি প্রধান উৎস। এ এলাকায় হাঁস সারা দিন চরিয়ে বেড়াতে পারে ফলে খাদ্য খরচ অনেকটা বেঁচে যায় এবং হাঁসের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। উপকূলীয় এলাকার গরিব মানুষের হাঁস পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য মুক্তির অন্যতম দিশারি হতে পারে। অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটানোও সম্ভব।

হাঁসের বাসস্থান বা হাঁসের ঘর

হাঁস সাধারণত তিন পদ্ধতিতে পালন করা হয়, যেমন: ছাড়া পদ্ধতি, অর্ধছাড়া পদ্ধতি ও আবদ্ধ পদ্ধতি।

গ্রামীণ পরিবেশে সাধারণত হাঁসকে রাতে আটকিয়ে রাখা হয়। কখনো কখনো দিনের কিছু সময় আটকে রাখা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অর্ধ ছাড়া পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি হাঁসের জন্য ১-২ বর্গফুট জায়গা রেখে আরামদায়ক ঘর তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি হাঁসের ঘরে যেন পর্যাপ্ত আলো বাতাস ঢুকতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। লাভজনক হাঁস পালনের অন্যতম শর্ত উন্নত ও আরামদায়ক বাসস্থান নিশ্চিত করা।

প্রাণিসম্পদ প্রকল্প পরিচালকের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

ঘরের মাপঃ প্রতিটি হাঁসের জন্য ১-২ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হবে। এই হিসাবে ঘর তৈরি করতে হবে।

উচ্চতাঃ ঘরের উচ্চতা হবে ২ ফুট।

মেঝেঃ মেঝে ইটের অথবা মাচা হলে ভালো হয়। এটি মাটিরও হতে পারে।

মাচাঃ মাচা হিসাবে বাঁশ, সুপারি গাছের বাতা অথবা কাঠের তক্তা ব্যবহার করা যেতে পারে । তবে এক্ষেত্রে সুপারি গাছ বা বাঁশ ফালি করে সমানভাবে বিছিয়ে দেওয়াই ভালো। দুই ফালির মধ্যবর্তী স্থানে আধা ইঞ্চি ফাঁকা রাখলে ময়লা নিচে পড়ে যেতে পারে ।

বেড়াঃ বাঁশের বাতা দিয়ে বেড়া তৈরি করা যেতে পারে।

চালাঃ ঘর দোচালা হলে ভালো হয়। তবে চালা হিসেবে খড়, শন, গোলপাতা, তাল পাতা ও টিন ব্যবহার করা যায়। এছাড়া বাঁশের চাটাই এবং পলিথিন দিয়েও চালা তৈরি করা যায় ।

হাঁসের বাসস্থান বা ঘর তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- **লিটার ব্যবস্থাপনাঃ** মাচা পদ্ধতি হলে, মাচা প্রতি দিন পরিস্কার করতে হবে। ইটের মেঝে হলে ঘরের মাঝেতে ৫-৬" পরিমাণ তুষ বা কাঠের শুকনো গুঁড়া বিছিয়ে দিতে হবে। ২-১ দিন পর পর এই লিটার ওলোট-পালট করে দিতে হবে। মাঝে মাঝে লিটার পরিবর্তন করে রোদে শুকানো ভালো, তাতে রোগ-বালাইয়ের সম্ভাবনা কমে যাবে।
- **ঘরে আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাঃ** হাঁসের ঘরে অবশ্যই আলো ও বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- **তাপমাত্রাঃ** বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা এ দুটো পরিবেশই হাঁসের ডিম উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে। ঘরে যাতে ২০-২৫ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

হাঁসের খাদ্য

হাঁস থেকে অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনের প্রধান শর্ত হলো তাদেরকে সঠিকভাবে সুষম খাদ্য দিতে হবে। খামারে অন্ততপক্ষে ১৫ দিনের জন্য হাঁসের খাদ্য মজুদ রাখতে হবে।

হাঁসের খাদ্য তৈরির সময় নিম্নলিখিত পুষ্টি উপাদানগুলোর প্রয়োজনীয় পরিমাণ অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন:১.শর্করা বা শ্বেতসার ২. আমিষ বা প্রোটিন ৩. স্নেহ বা তৈল ৪.ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ৫.খনিজ পদার্থ বা লবণ এবং ৬. পানি।

খাদ্যের উৎস ও কার্যাবলি

শর্করা: শস্যকণা যেমন:ধান, গম, ভুট্টা, গমের ভুসি, চাউলের কুঁড়ার মধ্যে শর্করা বিদ্যমান। এই জাতীয় খাদ্য হাঁসের দেহে তাপ ও শক্তি যোগায়। হাঁসের ডিমের কুসুম তৈরি ও চর্বি উৎপাদনেও এ ধরনের খাদ্য কাজে লাগে।

আমিষ: শুঁটকি মাছের গুঁড়া, খৈল, খেসারি, মাসকলাই, মাছের নাড়িভুঁড়ি, কেঁচো ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ থাকে। এ জাতীয় খাদ্য হাঁসের শরীরের ক্ষয়পূরণ, মাংস বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন, তাপশক্তি বৃদ্ধি ও চর্বি উৎপাদনে কাজে লাগে।

চর্বি: সরিষা, সয়াবিন, বাদাম তৈল, যেকোনো প্রকারের ভেষজ তৈল এবং বীজে প্রচুর পরিমাণে চর্বিজাতীয় খাদ্য বিদ্যমান। চর্বিজাতীয় খাদ্য দেহে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রয়োজনে তাপ ও শক্তি যোগায়।

ভিটামিন: সবুজ ঘাস, হলদে শস্যকণা, মাংস ও মাছের শুঁটকিতে ভিটামিন মজুদ থাকে। সূর্যের আলো ও কডলিভার ওয়েলে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। ভিটামিনের অভাবে আমিষ, শর্করা, তেল ও খনিজ পদার্থ শরীরের অভ্যন্তরে প্রক্রিয়াজাত না হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। ভিটামিন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।

খনিজ পদার্থ: ঝিনুকের গুঁড়া, অস্থি গুঁড়া, চুনা পাথর,ডিমের খোসা ইত্যাদিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে। এজাতীয় খাদ্য হাঁসের দেহের অস্থি বর্ধন ও ডিম প্রস্তুত করে।

আইসিবিএএআর প্রকল্পের প্রাক্তন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও বর্তমান তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব জনাব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী (ডানে), প্রাক্তন জাতীয় উপপ্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব শামসুর রহমান খান (বামে) এবং উপপ্রধান বন সংরক্ষক গোবিন্দ্র চন্দ্র রায় (বাম থেকে দ্বিতীয়) প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক কর্মসূচি ব্যাখ্যা করছেন

হাঁসের ডিম সংগ্রহ ও বাচ্চা ফোটানো ব্যবস্থাপনা

হাঁসের ডিম সংগ্রহ

হাঁস সাধারণত ভোর রাতের দিকে ডিম পাড়ে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সকাল ৯ টা পর্যন্ত ডিম পাড়তে দেখা যায়। কাজেই ডিমপাড়া হাঁসকে ডিমপাড়া শেষ হলে অর্থাৎ সকালে একটু বিলম্বে বাইরে ছাড়তে হবে। ডিমপাড়া শেষ হলে ডিম তুলে ঠান্ডা ও নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে।

ফোটানোর জন্য ডিম বাছাই

ডিম ফোটানোর জন্য অবশ্যই নিষিক্ত ডিম বাছাই করতে হবে। ডিম যাতে নিষিক্ত হয় সেলক্ষ্যে ১০ টি স্ত্রী হাঁসের জন্য ১টি পুরুষ হাঁস রাখা প্রয়োজন।

ডিম ফোটানোর পদ্ধতি

হাঁসের ডিম দুভাবে ফোটানো হয়। কৃত্রিম পদ্ধতিতে ইনকিউবেটর ও হাঁস বা মুরগির মাধ্যমে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে।

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ডিম ফোটানোর জন্য হাঁস/মুরগী বাছাই

মাসকোভী ছাড়া অন্য কোনো জাতের হাঁস ডিমে তা দেয় না। তাই প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ডিম ফোটানোর জন্য একমাত্র মাসকোভী জাতের হাঁস কিংবা সুস্থ কুঁচে মুরগী বাছাই করতে হবে।

ডিম ফোটার সময়

হাঁসের ডিম ফুটতে ২৮ দিন সময় লাগে। তবে মাসকোভী হাঁসের ডিম ফুটতে ৩২-৩৫ দিন সময় লাগে।

হাঁসের বাচ্চার যত্ন ও পরিচর্যা

হাঁসের বাচ্চাকে মা হাঁস বা মুরগীর সাথে রাখার বয়স

হাঁসের বাচ্চা ফোটার পরে ৩-৪ দিন মা হাঁস বা মা মুরগির সাথে আটকে রাখা প্রয়োজন। এতে করে মা হাঁস বা মুরগী ভালোভাবে বাচ্চার যত্ন নিতে পারে।

বাচ্চাকে মা থেকে আলাদা করার সময় ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান

৩-৪ দিন পরে মা থেকে বাচ্চাকে আলাদা করে আটকে রেখে ভালোভাবে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। তাহলে বাচ্চার বৃদ্ধি দ্রুত হবে।

বাচ্চাকে আটকে রাখার বয়স

১০-১৫ দিন বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে নদী, খাল, বিলে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাই এসময় বাচ্চাকে বাড়িতে আটকে রাখতে হবে।

প্রকল্প সহায়তায় প্রাণিসম্পদ বিভাগের টিকাদান

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব (১০টি হাঁস পালন)

ব্যয়ের খাত

ব্যয়ের খাত	বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
হাঁস	১০টি (৮টি হাঁসি, ২টি হাঁসা) ৪ মাস বয়সি	১০টি	৩০০.০০	৩০০০.০০
ওষুধ/ভিটামিন	আনুমানিক খরচ			১৫০.০০
খাদ্য		১০ কেজি	৪৫.০০	৪৫০.০০
ঘর	বাঁশ/কাঠ, ছন,পলিথিন, টিন			১০০০.০০
টিকা	ডাকপ্লেগ ও কলেরা			১০০.০০
প্রাকৃতিক খাদ্য	শামুক/ঝিনুক/মাছ/কীট-পতঙ্গ			-
মোট খরচ				**৪৭০০.০০**

আয়ের খাত

আইটেম	বিবরণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মাসিক (টাকা)
ডিম	প্রতিদিন ৭টি	১০.০০	৭০.০০	২১০০.০০
বিষ্ঠা ও লিটার				২০০.০০
হাঁসের মূল্য	১০টি	৪০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০

বি.দ্র. ১০ টি হাঁসের ও ঘরের মূল্য বাদ দিলে প্রতিমাসে নিট লাভ প্রায় ১৫০০ টাকা।টিকা খরচ দরকার প্রতি ৬ মাস পরপর এ ছাড়া ঘর যদি মালিক আরও কম খরচে করতে পারে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার সরবরাহ করতে পারে তবে লাভ আরও বেশি হবে।

উপসংহার: বারো মাস হাঁস চাষে অর্থ-পুষ্টি দুই আসে। উপকূলীয় এলাকায় হাঁস পালন করে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় তেমনি বেকার সমস্যার সমাধানের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে এ হাঁস পালন। এজন্য দরকার সরকারি বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগ।

তথ্যসূত্র

১. ইউএসএইড প্রসার প্রকল্প হাঁস পালন
২. ডিএলএস ওয়েবসাইট
৩. চর জীবিকায়ন কর্মসূচির হাঁস পালন মডিউল
৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমএপি প্রকল্পের হাঁস পালন মডিউল

হাইড্রোফনিক ঘাস

সবুজ ঘাস গবাদিপশুর জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। কিন্তু জমির স্বল্পতা এবং মিষ্টি পানির অভাবে গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে প্রয়োজনের তুলনায় ঘাস অনেক কমে যাচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার প্রভাবে গো-খাদ্যের চরম সংকট তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণে বিকল্প পদ্ধতিতে জমি বা মাটি ছাড়া পরিমিত পানি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে উচ্চ পুষ্টিমানযুক্ত ঘাসজাতীয় গবাদিপশুর খাদ্য তৈরি করার পদ্ধতিই হলো হাইড্রোফনিক ঘাস চাষ। পদ্ধতিটি উপকূলীয় প্রেক্ষাপটে গবাদিপশুর খাদ্যের সংকট নিরসনে একটি প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন কর্মপন্থা। হাইড্রোফনিক ঘাস চাষের অনেক পদ্ধতি আছে। তবে একটা দরিদ্র কৃষক পরিবারে কীভাবে হাইড্রোফনিক ঘাস চাষ ও তার প্রসার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে লবণাক্ততার প্রভাব বেশি এবং ঘাস জন্মানোর মতো যথেষ্ট জমি নেই সেখানে এটি বিশেষভাবে উপযোগী। এই পদ্ধতিতে ঘাস উৎপাদনের জন্য কৃষকের বাড়িতে গরু-ছাগল-মহিষের ঘরের সামনে ছোট্ট একটা জায়গায়ই যথেষ্ট। হাইড্রোফনিক ঘাস উৎপাদন করে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে উন্নত প্রজাতির গরু পালন করতে হবে কারণ দেশি প্রজাতির গরুর দুধ উৎপাদন হার অনেক কম।

জলবায়ু সহনশীলতা

হাইড্রোফনিক ঘাস চাষ যেহেতু কৃষক পরিবারের বাড়ির উঠানে বা ঘরের আশেপাশে অথবা ঘরের ভিতরে স্থাপন করা যায় তাই বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এটাকে সহজে রক্ষা করা যায় এবং ঘাস উৎপাদন ব্যাহত হয় না। বন্যার সময় এলাকা পানিতে ডুবে গেলেও গবাদিপশুর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। এটি স্বল্প পুঁজি, শ্রম ও লাগসই প্রযুক্তি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

একটি কাঠ, প্লাস্টিক বা স্টীলের র‍্যাক, কয়েকটি ট্রে (প্লাস্টিকের হলে ভালো মরিচা পড়ে না), মোটা কাপড় বা ঘানি ব্যাগ, প্লাস্টিক বালতি বা গামলা, প্লাস্টিক পাইপ, ভুট্টা, গম, ধান ইত্যাদির বীজ।

হাইড্রোফনিক সিস্টেমের গঠন

হাইড্রোফনিক ঘাস তৈরির উপকরণগুলো একটা ছায়াযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয় যাতে তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপযোগী তাপমাত্রা ২৫-৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮০-৮৫ শতাংশ। র‍্যাক দুই, তিন বা চার স্তরের হতে পারে। স্তরে স্তরে ১৫-২০টি ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের ট্রেগুলো সাজানো থাকে। র‍্যাকের উচ্চতা মানুষের উচ্চতার সমান হবে যাতে সহজে র‍্যাকে বীজ বা পানি দেওয়া বা অপসারণ করা সহজ হয়। ট্রেগুলো থেকে যাতে পানি অপসারণ করা যায় তার জন্য একটা প্লাস্টিকের পাইপ সংযুক্ত থাকে।

হাইড্রোফনিক ঘাস উৎপাদন প্রক্রিয়া

- একটি প্লাস্টিক গামলায় ৫-৭ লি. সামান্য উষ্ণ গরম পানি নিই।
- ১-১.৫ কেজি বীজ পানিতে ভিজিয়ে দিই। ভাসন্ত বীজগুলো ফেলে দেই কারণ সেগুলো অঙ্কুরোদগম হবে না। ভালো ঘাস পাওয়ার জন্য ভালো মানের বীজ ব্যবহার করতে হবে। ভুট্টা, গম, ধান এবং ডালজাতীয় বীজ সবচেয়ে উপযোগী (ভুট্টা ও গমের বীজ ব্যবহার করলে খরচ কম হয়)।
- পানিতে ৫০-১০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে দেই যেটা ছত্রাকনাশক হিসেবে কাজ করবে।
- ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে (ভুট্টার ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা) যাতে বীজগুলো পানিতে ভিজে ফুলে উঠে।
- ১২/২৪ ঘণ্টা পর পানি ফেলে দিয়ে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নিই এবং সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশনের জন্য বীজগুলোকে একটা কাপড়ে নিয়ে ১ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রেখে দিই।
- ধৌত করা বীজগুলো ঘানি ব্যাগ বা মোটা কাপড়ে পেঁচিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে (বা একটা বালতির মধ্যে রেখে উপরে ঢেকে দিই যাতে কোনো আলো-বাতাস প্রবেশ করতে না পারে) ২৪ ঘণ্টা রেখে দিই। তবে শীতপ্রধান হলে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে বীজগুলো অঙ্কুরোদগম হয়ে যাবে।

অঙ্কুরিত বীজগুলো সতর্কতার সাথে আবারো ধুয়ে র‍্যাকে সাজানো প্লাস্টিকের ট্রে-তে স্থাপন করি। এমনভাবে রাখি যাতে অঙ্কুরিত বীজগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে কিন্তু একটার উপর আর একটা না উঠে। তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেগুলো কালো কাপড় দিয়ে ২ দিন ঢেকে রাখি। ট্রে-তে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পানির স্প্রে করতে হবে। আবহাওয়া বেশি গরম হলে প্রতি দুই ঘণ্টা পরপর পানির স্প্রে প্রয়োজন হতে পারে।

পুরো সিস্টেম সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখতে হবে। অঙ্কুরিত বীজ বা চারা সরানো বা নাড়ানো যাবে না। ৭ দিন পরে চারা বা ঘাস সংগ্রহ করতে হবে। ৭ দিন পরে ১ কেজি ভুট্টার বীজ থেকে ৮ কেজি ঘাস

বা চারা উৎপাদিত হবে। সংগৃহীত ঘাস ছোট্ট ছোট্ট করে কেটে গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিদিন যদি ৩ টা ট্রে-র ঘাস প্রয়োজন হয় তাহলে ২১ টা ট্রে ব্যবহার করতে হবে।

ব্যবহার

- উৎপাদিত ঘাস ছোট্ট ছোট্ট করে কেটে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হাঁস, মুরগি ইত্যাদিকে খাওয়াতে হবে।
- ঘাস ৯ দিনের বেশি রাখা যাবে না কারণ তার পুষ্টিমান কমে যাবে এবং আঁশযুক্ত হবে।
- হাইড্রোফনিক ঘাস অন্যান্য নিয়মিত খাদ্যের সাথে অতিরিক্ত খাদ্য হিসেবে খাওয়াতে হবে।

গুণাগুণ ও উপকারিতা

- স্থানীয় ঘাস বা শুকনো গো-খাদ্যের চেয়ে উচ্চপুষ্টিমানসম্পন্ন কর্বোহাইড্রেট, মিনারেল ও ভিটামিন থাকে।
- এক সপ্তাহে উৎপাদন করা যায়। এই সময়ে ৮-১০ ইঞ্চি ঘাস উৎপাদন করা যায়। যেখানে স্থানীয় ঘাস তৈরি করতে ২ মাস সময় লাগে।
- স্বল্প পানি ব্যবহার করে হাইড্রোফনিক ঘাস উৎপাদন করা যায়। ১ কেজি হাইড্রোফনিক ঘাস তৈরি করতে ৩-৪ লিটার পানির প্রয়োজন হয়।
- গবাদিপশুর প্রজনন সক্ষমতা ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
- নিয়মিতভাবে বছরের সবসময় হাইড্রোফনিক ঘাস উৎপাদন করা যায়।
- কোনো প্রকার কেমিক্যাল বা কীটনাশকের প্রয়োজন হয় না।
- স্বল্প শ্রমে ও ব্যয়ে হাইড্রোফনিক ঘাস উৎপাদন করা যায়।
- উৎপাদিত ঘাসের অপচয় হয় না।
- এটি সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না।

আয়-ব্যয়

একটা হাইড্রোফনিক উৎপাদন প্রক্রিয়া স্থাপন করতে পার্শ্ববর্তী ব্যয় প্রয়োজন হবে। অনুমেয় যে, উন্নত প্রজাতির ২ টি গাভি পালনকারী একটা কৃষক পরিবার।

ক্রম	প্রয়োজনীয় উপকরণ	খরচ (টাকা)
০১	কাঠের র‍্যাক (১ টা)	৪৫০০.০০
০২	ট্রে (১৪ টা)	১০০০.০০
০৩	বালতি ১ টা	২০০.০০
০৪	বীজ (ভুট্টা, ১ কেজি)/প্রতিদিন	৮০.০০
	মোট:	৫৭৮০.০০

স্থাপন খরচ বাদে প্রতিদিনের খরচ

১ কেজি ভুট্টা বা ধান বীজ যার দাম ভুট্টা হলে ১ কেজির দাম ৮০.০০ টাকা আর ধান হলে ১ কেজির দাম ১৫.০০ টাকা।

২ টা উন্নত জাতের গাভি থেকে স্বাভাবিক খাদ্য খাওয়ার পর প্রতিদিন ২৪ (১২+১২) লিটার দুধ পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য ৪০.০০ টাকা লিটার দরে ৯৬০.০০ টাকা। হাইড্রোফনিক ঘাস খাওয়ানোর পর গাভির দুধ উৎপাদন ২৫% বেড়ে যায়। আর তখন দুধ উৎপাদন হবে ৩০ লিটার। যার বাজারমূল্য হবে ১২০০.০০ টাকা। প্রতিদিন বাড়তি আয় হবে ২৪০.০০ টাকা। আর প্রতিদিন খরচ হবে (১ কেজি ভুট্টা বীজ) ৮০.০০ টাকা। সুতরাং প্রতিদিন নিট বাড়তি লাভ ১৬০.০০ টাকা।

সাধারণ ঘাস ও হাইড্রোফনিক ঘাসের তুলনামূলক পার্থক্য

হাইড্রোফনিক ঘাস	সাধারণ ঘাস
■ মাটি ছাড়া ঘাস উৎপাদন করা যায়।	■ মাটি বা জমির প্রয়োজন হয়।
■ ৭-৯ দিন সময়ে উৎপাদন করা যায়।	■ ২ মাস সময় লাগে।
■ পুষ্টিমান অনেক বেশি।	■ পুষ্টিমান কম।
■ হাইড্রোফনিক ঘাসে এনার্জির পরিমাণ ৪৭২৭ কিলো ক্যালোরি/কেজি।	■ সাধারণ ঘাসে এনার্জির পরিমাণ ২৬০০ কিলো ক্যালোরি/কেজি।
■ প্রোটিনের পরিমাণ ৩১.৯৯%।	■ প্রোটিনের পরিমাণ ১১.৫০%।
■ প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।	■ প্রজনন ক্ষমতা তুলনামূলক কম বৃদ্ধি করে।
■ ১ কেজি ঘাস উৎপাদন করতে ৩-৪ লিটার পানির প্রয়োজন।	■ ১ কেজি ঘাস উৎপাদন করতে ৭০-১০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়।
■ কোনো কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।	■ প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়।
■ সারা বছর ঘাস উৎপাদন করা যায়।	■ সারা বছর ঘাস উৎপাদন ব্যাহত হয়।

সাইলেজ

আপদকালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা) সময়ে সাধারণত গবাদিপশুর খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এসময় গবাদিপশুর খাদ্যের যোগান নিয়ে খামারিরা দুশ্চিন্তায় থাকেন। খামারিদের দানাদার খাবার সংগ্রহ করতেও অসুবিধা হয়। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, মহামারি (কোভিড-১৯) এরকম আপদকালীন গবাদিপশুর খাদ্য যোগানের জন্য সাইলেজ পদ্ধতি হতে পারে অন্যতম অবলম্বন।

বাংলাদেশের বৃষ্টি মৌসুমে কোনো কোনো এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ঘাস পাওয়া যায়, যেমন: দূর্বা, বাকসা, আরাইল, সেচি, দল, শস্য খেতের আগাছা ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন গাছের পাতা যা গো-খাদ্য হিসেবে

প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সাইলেজ তৈরি

ব্যবহার হয়, যেমন: ইপিল ইপিল, ধৈঞ্চা, কলাগাছ ইত্যাদি। দেশীয় এ সমস্ত সবুজ ঘাস অথবা জমিতে চাষ করা নেপিয়ার, পারা, ভুট্টা, সরগম, ওট, কলাগাছ ইত্যাদি খুব সহজেই সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়।

সাইলেজ একটি ইংরেজি শব্দ যা দ্বারা গবাদিপশুর খাদ্যের বেলায় সবুজ ঘাসের পুষ্টিমান অক্ষণ্ন রেখে একটি নির্দিষ্ট অম্লতায় বা ক্ষারত্বে সংরক্ষিত ঘাসকে বোঝায়। সাধারণত খড়জাতীয় খাদ্য ব্যতীত সব ধরনের সবুজ ঘাসই অম্লতায় সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণের পর বছরের যেকোনো সময় সংরক্ষিত ঘাস তুলে সরাসরি গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়। তবে বন্যা বা যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ঘাসের সংকট পূরণে বা আপদকালীন সাইলেজ খুবই প্রয়োজনীয়। বর্ষা মৌসুমে প্রাপ্ত সবুজ ঘাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয়াংশ থাকে। এ ধরনের ঘাসে সাইলেজ তেমন ভালো হয় না।

তবে এ সমস্ত সবুজ ঘাস বা কলাগাছ কুচির সঙ্গে শতকরা ১৫ -২০ ভাগ শুকনো খড়ের স্তর দিলে একদিকে যেমন সাইলেজের গুণাগুণ ভালো থাকে, অন্যদিকে সাইলেজের নির্যাস চুঁইয়ে খড়ের খাদ্যমানও বৃদ্ধি করে। এতে একটা বাড়তি সুবিধা হলো পরবর্তীতে শুকনো খড় আলাদা করে আর খাওয়ানো লাগে না।

খড়ের অভাব থাকলে খড় না দিলেও সাইলেজ করা যাবে। ডাল বা লিগুমজাতীয় ঘাস যেমন: খেসারি, মাসকলাই, কাউপি বা হেলেন ডাল, ইপিল ইপিল ইত্যাদি ঘাসও সবুজ অবস্থায় সাইলেজ করে রাখা যায়। এ ধরনের ঘাসে অধিক পরিমাণে প্রোটিন বা আমিষ থাকে বিধায় শুধু ডালজাতীয় ঘাস দ্বারা সাইলেজ করলে ভালো সাইলেজ নাও হতে পারে। এজন্য এ ধরনের ঘাস অডাল বা নন-লিগুমজাতীয় ঘাসের (ভুট্টা, নেপিয়ার ইত্যাদি) সাথে সর্বোচ্চ ১ঃ১ এবং সর্বনিম্ন ১ঃ৩ অনুপাতে মিশিয়ে চিটাগুড় দিয়ে সাইলেজ করা ভালো। নন-লিগুমজাতীয় ঘাস পাওয়া না গেলে শুকনা খড়ের সাথে মিশিয়েও সাইলেজ তৈরি করা যায়।

মাটির গর্ত: একশ সিএফটি একটি মাটির গর্তে ২.৫০-৩.০০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। গর্তটি অবশ্যই উঁচু জায়গায় (যেখানে পানি ঢুকতে না পারে) হতে হবে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হবে। দৈর্ঘ্যের মাপ নির্ভর করবে ঘাসের পরিমাণের ওপর। গর্তটির তলা পাতিলের মতো সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে।

পলিথিন

মাটির সাইলোর চারদিকে পলিথিন মুড়ে সাইলেজ করলে অবশ্যই নিশ্চিন্তে রাখা যায়। কিন্তু পলিথিনের ব্যবহার ঘাসের সংরক্ষণ খরচ বাড়িয়ে দেয় এজন্য সাইলোর তলায় এবং চারিদিকে শুকনো খড় দিয়ে মাটি ঢেকে দেওয়া যায়। দুই গজ চওড়া ডাবল পলিথিনের ৮- ৯ গজ হলেই ২০ ফুটের একটি সাইলোর শুধু উপরের দিক বন্ধ করা যায়।

সাইলেজ তৈরি পদ্ধতি

সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ঃ৩ পরিমাণে পানি মিশালে এটি ঘাসের উপর ছিটানো উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশাতে হবে। সাইলোর তলায় পলিথিন দিলে আগে বিছিয়ে নিতে হবে। পলিথিন না দিলে পুরু করে খড় বিছাতে হবে। এরপর দু'পার্শ্বে পলিথিন না দিলে ঘাস সাজানোর সাথে সাথে খড়ের আস্তরণ দিতে হবে। এরপর পরতে পরতে সবুজ ঘাস এবং শুকনো খড় দিতে হবে।

প্রতি পরতে ৩০০ কেজি সবুজ ঘাস এবং ১৫ কেজি শুকনো খড় দিতে হবে। ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসাবে ৯-১২ কেজি চিটাগুড় ও ৮-১০ কেজি পানির মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোনো চিটাগুড় দিতে হবে না। এভাবে পরতে পরতে ঘাস ও খড় সাজাতে হবে। যত এঁটে ঘাস সাজানো হবে তত সুন্দর সাইলেজ তৈরি হবে। এভাবে সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। ঘাস সাজানো শেষ হলে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরণ দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সবশেষে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে। সম্পূর্ণ ঘাস এক দিনেই সাজানো যায়। তবে বৃষ্টি না থাকলে প্রতিদিন কিছু কিছু করেও কয়েক দিনব্যাপী সাইলেজ তৈরি করা যায়। নিচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না। তাতে পানি জমে সাইলেজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সাইলেজ তৈরির সময় লক্ষণীয় বিষয়

- উপরের পলিথিন সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোনো পানি সাইলেজের মধ্যে না ঢুকে।
- চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে। বেশি পাতলা হলে ঘাস হতে চুঁইয়ে নিচে চলে যাবে। এমনভাবে দ্রবণ তৈরি করতে হবে যাতে আঠার মতো ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।
- ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়।
- সাইলোর কোণগুলো এবং পাশসমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা বন্ধ হয়ে যায়।
- ঘাসের সাথে খুব বেশি পানি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

খাওয়ানোর নিয়ম

এভাবে সংরক্ষিত ঘাস প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০ কেজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আপদকালীন গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণে সবুজ ঘাসের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বা সাইলেজ পদ্ধতি দিন দিন ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি আইসিবিএএআর প্রকল্পের এই প্রযুক্তিটি প্রকল্প এলাকার খামারিরা অনুশীলন করছে। আইসিবিএএআর প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল বিভিন্ন কার্যক্রম উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারিদের জলবায়ু অভিযোজনে নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

টার্কি পালন

টার্কি (Turkey) মূলত উত্তর আমেরিকার পাখি। স্পেনিশরা এটিকে মেক্সিকো থেকে ইউরোপে নিয়ে আসে এবং গৃহপালিত পাখি হিসেবে পোষ মানায়। তারপর এটিকে সাথে করে বিভিন্ন উপনিবেশগুলোতে নিয়ে যায়। এটি এক ধরনের বড় আকৃতির পাখিবিশেষ। বিশ্বের সর্বত্র টার্কি গৃহপালিত পাখিরূপে লালন-পালন করা হয়। তবে সবচেয়ে বেশি টার্কি পালন করা হয় আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড ও ভারতে। এরা পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

মূলত মাংসের জন্য পালন করা হয়। তবে বাংলাদেশে অনেকে সৌখিনতার জন্য পালন করে থাকে। পালনের জন্য তেমন উন্নত অবকাঠামো দরকার হয় না । এরা প্রতিদিন মোট খাদ্যের ৫০-৬০ ভাগ নরম ঘাস খায়। তাই খাবার খরচ কম। রোগবালাই কম বলে চিকিৎসা খরচ কম। মাংস উৎপাদনের দিক থেকে খুবই ভালো (৬ মাস বয়সে ৫-৬ কেজি)। পাখির মাংস হিসেবে এটা মজাদার এবং কম চর্বিযুক্ত। তাই গরু বা খাসির মাংসের বিকল্প হতে পারে। আমাদের দেশে অনেকের ব্রয়লার মুরগির মাংসের ওপর অনীহা আছে। তাদের জন্য এটা হতে পারে প্রিয় খাবার। প্রোটিনের নতুন আরেকটি উৎস হিসেবে টার্কি হতে পারে বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত। আমাদের দেশের অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে পশুপাখি পালন অন্যান্য দেশের তুলনায় সহজ। আবার কিছু প্রাণী আছে যারা দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। আর টার্কি পাখি সে রকম একটি সহনশীল জাত, যেকোনো পরিবেশে দ্রুত এরা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এরা বেশ নিরীহ ধরনের পাখি, মুক্ত অথবা খাঁচা উভয় পদ্ধতিতে পালন করা যায়। ৬-৭ মাস বয়স থেকে ডিম দেওয়া শুরু করে এবং বছরে ২-৩ বার ১০-১২টি করে ডিম দেয়। একটি মেয়ে টার্কির ৫-৬ কেজি এবং পুরুষ টার্কি ৮-১০ কেজি ওজন হয়। এদের মাংস উৎকৃষ্ট স্বাদের। ঘাস, পোকামাকড়, সাধারণ খাবার খেতে এরা অভ্যস্ত, তবে উন্নত খাবার দিলে ডিম ও মাংসের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। ৪-৫ মাস বয়সের টার্কি ক্রয় করা ভালো, এতে ঝুঁকি কম থাকে এবং লিঙ্গ নির্ধারণ সহজ হয়, এরকম বয়সের এক জোড়া টার্কির দাম হবে প্রায় ৪৫০০-৫০০০ টাকা। প্রথমে বাণিজ্যিকভাবে শুরু না করে ৮-১০ জোড়া দিয়ে শুরু করা ভালো, কারণ তাতে সুবিধা অসুবিধাগুলো নির্ণয় করা সহজ হয়।

টার্কির রোগবালাই: টার্কি পাখির তেমন বড় কোনো রোগবালাই নেই। চিকেন পক্সের টিকা নিয়মিত দিলে এ রোগ এড়ানো সম্ভব। অতি বৃষ্টি বা বেশি শীতের সময় মাঝে মাঝে ঠান্ডাজনিত রোগ দেখা যায়। তবে নিয়মিত টিকা দিলেএসব রোগ থেকে সহজেই টার্কিকে রক্ষা করা যায়।

টিকা প্রদানসূচি: রানীক্ষেত- এক দিন থেকে সাতদিন বয়সে। ২১দিন বয়সে আবার রানীক্ষেত। ৪র্থ ও ৫ম সপ্তাহ- ফাউল পক্স এবং ৮-১০ সপ্তাহ - কলেরা ভ্যাকসিন।

টার্কি পালনের সুবিধা

- টার্কির মাংস উৎপাদন ক্ষমতা অনেক। টার্কি ব্রয়লার মুরগির থেকে দ্রুত বাড়ে।
- ঝামেলাহীনভাবে দেশি মুরগির মতো পালন করা যায়; অল্প পুঁজিতে একটি আদর্শ টার্কির খামার করা যায়।
- টার্কি পালনে তুলনামূলক খরচ কম, দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি ঘাস, লতা-পাতা খেতেও পছন্দ করে।
- টার্কি দেখতে সুন্দর, তাই বাড়ির শোভা বর্ধন করে।
- টার্কির মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি, চর্বি কম। তাই গরুর কিংবা খাসির মাংসের বিকল্প হতে পারে।
- টার্কির মাংসে অধিক পরিমাণ জিংক, লৌহ, পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন ই ও ফসফরাস থাকে। এ উপাদানগুলো মানব শরীরের জন্য উপকারী এবং নিয়মিত এ মাংস খেলে কোলেস্টেরল কমে যায়।
- টার্কির মাংসে এমাইনো এসিড ও ট্রিপটোফেন অধিক পরিমাণে থাকায় এর মাংস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- অন্যান্য পাখির তুলনায় রোগবালাই কম এবং কিছু নিয়ম মেনে চললে খামারে ঝুঁকি অনেক কমে যায়।
- উচ্চমূল্য থাকায় খরচের তুলনায় আয় অনেক বেশি।

পালন পদ্ধতি

দুইভাবে টার্কি পালন করা যায়- ০১. মুক্ত চারণ পালন পদ্ধতি ও ০২. নিবিড় পালন পদ্ধতি

মুক্ত চারণ পালন পদ্ধতি

মুক্ত চারণ পদ্ধতিতে এক একর ঘেরা জমিতে ২০০-২৫০টি পূর্ণবয়স্ক টার্কি পালন করা যায়। রাতে পাখি প্রতি ৩-৪ বর্গফুট হারে জায়গা লাগে। চরে খাওয়ার সময় তাদের শিকারি জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ছায়া ও শীতল পরিবেশ জোগানের জন্য খামারে গাছ রোপণ করতে হবে। চারণ ভূমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করতে হবে এতে পরজীবীর সংক্রমণ কম হয়।

সুবিধা: খাবারের খরচ ৫০ শতাংশ কম হয়। স্বল্প বিনিয়োগ ও খরচের তুলনায় লাভের হার বেশি।

মুক্ত চারণ ব্যবস্থায় খাবার : টার্কি খুব ভালোভাবে আবর্জনা খুঁটে খায় বলে এরা কেঁচো, ছোট পোকামাকড়, শামুক, রান্নাঘরের বর্জ্য ও উইপোকা খেতে পারে, যাতে প্রচুর প্রোটিন আছে ও যা খাবারের খরচকে ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। এছাড়া শিম জাতীয় পশুখাদ্য যেমন: লুসার্ন, ডেসম্যান্থাস, স্টাইলো এসব খাওয়ানো যায়। চরে বেড়ানো পাখিদের পায়ের দুর্বলতা ও খোঁড়া হওয়া আটকাতে খাবারে ঝিনুকের খোসা মিশিয়ে সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম হিসাবে ক্যালসিয়াম দিতে হবে।

খাবারের খরচ কম করার জন্য শাক-সবজির বর্জ্য অংশ দিয়ে খাবারের ১০ শতাংশ পরিমাণ পূরণ করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্যরক্ষা: মুক্ত চারণ ব্যবস্থায় পালিত টার্কির অভ্যন্তরীণ (গোল কৃমি) ও বাহ্য (ফাউল মাইট) পরজীবী সংক্রমণের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি থাকে। তাই পাখিদের ভালো বিকাশের জন্য মাসে একবার ডিওয়ার্মিং ও ডিপিং করা আবশ্যক।

নিবিড় পালন পদ্ধতি : বাসস্থান টার্কিদের রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া, শিকারি জীবজন্তু থেকে বাঁচায় ও আরাম জোগায়। অপেক্ষাকৃত গরম অঞ্চলগুলোতে খামার করলে ঘরগুলো লম্বালম্বি পূর্ব থেকে পশ্চিমে রাখতে হবে। খোলা ঘরের প্রস্থ ৯ মিটারের বেশি হওয়া চলবে না। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঘরের উচ্চতা ২.৬ থেকে ৩.৩ মিটারের মধ্যে থাকতে হবে। বৃষ্টির ছাঁট আটকাতে ঘরের চালা এক মিটার বাড়িয়ে রাখতে হবে। ঘরের মেঝে সস্তা, টেকসই, নিরাপদ ও আর্দ্রতারোধক বস্তু যেমন কংক্রিটের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কম বয়সি এবং প্রাপ্তবয়স্ক পাখির ঘরের মধ্যে অন্তত ৫০ থেকে ১০০ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং পাশাপাশি দুটি ঘরের মধ্যে অন্তত ২০ মিটার দূরত্ব থাকতে হবে। ডিপলিটার পদ্ধতিতে টার্কি পালনের সাধারণ পরিচালনা ব্যবস্থা মুরগি পালনেরই মতো, তবে বড় আকারের পাখিটির জন্য যথাযথ বসবাস, ওয়াটার ও ফিডারের জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সুবিধা: উন্নত উৎপাদন দক্ষতা; উন্নততর পরিচালন ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ।

নিবিড় পালন ব্যবস্থায় খাদ্য : নিবিড় পালন ব্যবস্থায় টার্কি মুরগিকে ম্যাশ ও পেলেট (ট্যাবলেট) দুইভাবেই খাবার দিতে হবে। মুরগির তুলনায় টার্কির শক্তি, প্রোটিন ও খনিজের প্রয়োজন বেশি। সেজন্য টার্কির খাবারে এগুলোর আধিক্য থাকতে হবে। খাবার মাটিতে না দিয়ে ফিডারে দিতে হবে। যেহেতু পুরুষ ও মাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তির (এনার্জি) পরিমাণ আলাদা, তাই ভালো ফল পাওয়ার জন্য তাদের পৃথকভাবে পালন করতে হবে। টার্কিদের সবসময় পরিস্কার পানির প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে ওয়াটারারের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে হবে এবং আপেক্ষাকৃত ঠিক সময়ে খাবার দিতে হবে।

সবুজ খাদ্য: নিবিড় পদ্ধতিতে ড্রাইম্যাশ হিসাবে মোট খাদ্যের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সবুজ খাবার দেওয়া যায়। সব বয়সের টার্কির জন্য টাটকালুসার্ন প্রথম শ্রেণির সবুজ খাদ্য। এছাড়া খাবারের খরচ কম করার জন্য ডেসম্যান্থাস ও স্টাইলো কুচি করে টার্কিদের খাওয়ানো যেতে পারে।

সম্ভাবনা

- রোগ-বালাই তুলনামূলকভাবে কম।
- গরু, ব্রয়লার ও খাসির মাংসের বিকল্প।
- ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে, যাতে মাংসের বাজার তৈরি হয়।

প্রধান সমস্যা

সাধারণ জনসাধারণের কাছে এখনও মাংসের গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক-ভাবে টার্কি মুরগি পালন দিনে দিনে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। টার্কি বাণিজ্যিক মাংস উৎপাদনের জন্য খুবই উপযুক্ত কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে ডিম উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত নয়।

টার্কি পালন দেখতে খুব সুন্দর হয় এবং আপনার বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। টার্কি মুরগি দ্রুত বড় হয়ে যায় এবং ব্রয়লার মুরগির মতো খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অন্যান্য পরিস্থিতিতে টার্কি মুরগি পালনের জন্য খুবই উপযুক্ত। এগুলোর পালন মুরগির মতো খুব সহজ। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক-ভাবে টার্কি পালন-ব্যবসা করে ভালো মুনাফা অর্জনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। একটুখানি সচেতনতা, সরকারি গবেষণা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক অংশগ্রহণে এ টার্কি-ই হয়ে উঠতে পারে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যম এমনকি ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উপায়।

জলবায়ু সহনশীল মিশ্র প্রজাতির ফল ও ফসল

প্রতিটি মানুষের সুস্থ -সবল থাকার জন্য খাদ্য তালিকায় ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। ফল রান্না ছাড়াও সরাসরি খাওয়া যায় ও তাতে বিদ্যমান সবটুকু পুষ্টি গ্রহণ করা যায়। এটি আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সহজ ও সস্তা উৎস। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে বিদ্যমান বিভিন্ন খনিজ উপাদান যেমন: ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি দেহের বৃদ্ধি ও বিপাক কার্যাবলি স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭০ প্রকারের ফল জন্মে এর মধ্যে ৪০টি ফল প্রচলিত আর ৩০ টি ফল অপ্রচলিত। বাংলাদেশে মোট ফসলভিত্তিক আয়ের ১০ শতাংশ আসে ফল থেকে। আমাদের প্রতিদিন যে পরিমাণ ফল খাওয়া দরকার আমরা সে পরিমাণ পাই না। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে সুষম খাদ্যের জন্য দৈনিক মাথাপিছু অন্তত ১১৫ গ্রাম ফল খাওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে মাথাপিছু দৈনিক ফলের প্রাপ্যতা হচ্ছে মাত্র ৭৫ গ্রাম। সুতরাং ফল উৎপাদনে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। দেশে বর্তমানে বছরে প্রায় ১২২ লাখ মেট্রিক টন ফল উৎপাদন হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফলের চাষও বিঘ্নিত হচ্ছে।

উপকূলীয় এলাকার বনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা কমাতে আইসিবিএ-এআর কর্মসূচি থেকে কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু সহনশীল ফল চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রকল্প থেকে নিম্নলিখিত জলবায়ু সহনশীল ও মিশ্র প্রজাতির ফল ও ফসল চাষে চাষিদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু ফল ও ফসলের বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. খাটোজাত বা হাইব্রিড নারিকেল-ওপি ভ্যারাইটি,
২. পেয়ারা,
৩. আপেল কুল,
৪. ড্রাগন ফল,
৫. উচ্চ ফলনশীল মরিচ,
৬. সূর্যমুখী তেল,
৭. মালটা,
৮. সফেদা ইত্যাদি।

ছবি: ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

খাটো জাতের নারিকেল

দেশে দু'ধরনের খাটো জাতের নারিকেলের চাষ হয়। একটি হলো ডিজে সম্পূর্ণ হাইব্রিড ডোয়াফ নারিকেল এবং অন্যটি হলো খাটো ওপেন পলিনেটেড (ওপি) জাত। এটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *Cocos nucifera*, এবং Arecaceae গোত্রের সদস্য। চারা রোপণের আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে ফল দেয়। নতুন উদ্ভাবিত এ নারিকেল গাছ বছরে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ টি ফল দেয়। দেশি নারিকেল ফল দেয় মাত্র ৫০টি। এ নারিকেল মাটিতে বসেই পাড়া সম্ভব। গাছের উচ্চতা ২ থেকে ৪ ফুট হলেই ফল ধরা শুরু করে। দেশি জাতের চেয়ে এর ফলন প্রায় ৪ গুণ বেশি। সরকার খর্বাকৃতির এই নারিকেল উৎপাদনে জোর দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ভিয়েতনাম থেকে সংগ্রহ করা জাতটি আবার ২ ধরনের, যথা: সিয়াম গ্রিন কোকোনাট ও সিয়াম ব্লু কোকোনাট। জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নারিকেল থেকেই এর চারা হয়। ২- ২.৫ বছরে গাছে মুচি আসে এবং প্রতিটি নারিকেল থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম পানি পাওয়া যায়। সিয়াম বুলু কোকোনাট জাতটির পানি খুবই মিষ্টি এবং সুগন্ধিযুক্ত। এটি বেঁটে প্রজাতির। নারিকেল পাড়া ও গাছ বাছাইসহ যত্ন নেওয়া সহজ। বর্তমানে নারিকেলে পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে গেছে। বড় গাছের পোকামাকড় অনেকক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না কিন্তু এ গাছের পোকামাকড় খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নারিকেল চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে কর্মরত ইন্দোনেশিয়াভিত্তিক এশিয়া প্যাসিফিক কোকোনাট কমিউনিটি সংস্থার মতে বাংলাদেশে প্রায় ৪০ কোটি নারিকেল গাছ লাগানো সম্ভব। ভিয়েতনাম থেকে আমদানিকৃত চারা সরকার উপকূলীয় ১৮টি জেলা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ভর্তুকি দিয়ে রোপণ করছে ও জনগণকে অনুপ্রাণিত করছে।

ভেষজ গুণ

এটি পিত্তনাশক ও কৃমিনাশক। ফলের মালা/আইচা পুড়িয়ে পাথরবাটি চাপা দিয়ে পাথরের গায়ে যে গাম/ কাই হয় তা দাদ রোগের জন্য উপকারী।

ব্যবহার

পানীয় হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নারিকেল গাছের প্রতিটি অঙ্গই কাজে লাগে।

ফলের পুষ্টি উপাদান

ডাবের পানিতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে। নারিকেলের শাঁসে স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। খাদ্যোপযোগী প্রতি-১০০ গ্রাম নারিকেলে ৮২.৮ গ্রাম জলীয় অংশ। মোট খনিজ পদার্থ ০.৬ গ্রাম, ৫.২ গ্রাম আঁশ, ৭৬ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১.৪ গ্রাম আমিষ, ১.১ গ্রাম চর্বি, ১৫.২ গ্রাম শর্করা, ২০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.৪ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.২১ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২ এবং ২১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান থাকে।

উপযুক্ত জমি ও মাটি

নারিকেল গাছের জন্য নিকাশযুক্ত দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি উত্তম।

চারা তৈরি

পরিপক্ব নারিকেল হতে বীজ নারিকেল তৈরি করা হয়।

চারা রোপণ

মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য আশ্বিন মাস চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত সময়। সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮ মিটার। প্রতি একরে ৬৩ টি চারা রোপণ করা যায়।

ছবি: ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

সার ব্যবস্থাপনা

সুপারিশকৃত উন্নত জাতের জন্য

সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)							
গাছের বয়স (বছর)	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরিক এসিড	জৈব সার (কেজি/গাছ/বছর)
রোপণের পূর্বে (গর্তে)	-	৫০	-	-	-	-	১২
১-৪	৯০	২০	১৫০	১৫	১২	১.৭	৫
৫-৭	১৮০	৪০	৩০০	৩০	১৫	২.৬	৭
৮-১০	৩৬০	৮০	৫০০	৪০	২০	৩.৪	১০
১১-১৫	৪৫০	১০০	৮০০	৫০	২৫	৫.১	১২
১৬-২০	৫৪০	১২০	১০০০	৫০	২৫	৬.৮	১৫
২০ এর বেশি	৬৭৫	১৫০	১২০০	৫০	২৫	৮.৫	২০

সূত্র: সার সুপারিশমালা হাত বই-২০১৮, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

প্রয়োগ পদ্ধতি

- সুপারিশকৃত জৈব সার এবং টিএসপি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে পানি দেওয়া দরকার হবে।
- বাড়ন্ত গাছের জন্য সুপারিশকৃত সার দুই ভাগে বৈশাখ এবং আশ্বিন মাসে গোড়া থেকে ১ হাত জায়গা বাদ দিয়ে ৪-৬ হাত জায়গা পর্যন্ত মাটির মধ্যে ৩-৫ ইঞ্চি গভীর করে গর্ত তৈরি করে তাতে সার দিয়ে মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

শুকনো মৌসুমে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার সেচ উত্তম। বর্ষা মৌসুমে পানি নিকাশ করা দরকার।

ফসল তোলা

ফুল ফোটার পর ১১-১২ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। পাকা অবস্থায় নারিকেলের রঙ সবুজ থেকে বাদামি, খয়রি রঙ ধারণ করে।

উপসংহার

দক্ষিণাঞ্চলের মাটি নারিকেল চাষের জন্য উপযোগী। ছোট পরিবার দুই-একটি নারিকেল গাছ লাগিয়ে তা থেকে প্রাপ্ত ফল বিক্রি করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকে। খাটো জাতের নারিকেল গাছ রোপণ করে সঠিক পরিচর্চা নিলে ফলন ও লাভ মিলবে। বাংলাদেশে দক্ষিণাঞ্চলে খাটো জাতের নারিকেল চাষ করে অধিক ফলন ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের (ডান থেকে দ্বিতীয়) খাটো জাতের নারিকেল চারা রোপণ উদ্বোধন

পেয়ারা

এটি বাংলার সার্বজনীন আপেল। অর্থকরী ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ফল। বিশ্বে পেয়ারা উৎপাদনে বাংলাদেশ ৮ম স্থান দখল করেছে। দ্রুত বর্ধনশীল, সীমিত জায়গায় ফলন এবং অতি ফলন এই ত্রিমাত্রিক গুণের অধিকারী। যা একদিকে সুস্বাদু পেট পুরে আহারযোগ্য আবার অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচনের ফল। এই ফল অত্যন্ত ফলনশীল এবং পুষ্টি মূল্যের দিক থেকে উৎকৃষ্ট। দামও সকলের নাগালের মধ্যে বিদ্যমান। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দক্ষিণাঞ্চলে আধুনিক জাতের পেয়ারা চাষ সম্প্রসারণ হচ্ছে। পেয়ারার নতুন বাগান তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে মিশ্র ফল বাগান তৈরি করে বিপদে-আপদে দরিদ্র কৃষকগণ উপকৃত হচ্ছে। গত বছরগুলোতে পেয়ারার মিশ্র বাগান অন্যান্য ফলের তুলনায় বেশি উৎপাদিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক পরিচয় ও বিস্তৃতি

এটি মেদিগাছ (Mirtaceae) গোত্রের অন্তর্গত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *Psidium guajava*। ইংরেজি নাম Guava। এর দ্বারা জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ, মোরব্বা ও চাটনি প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন কোম্পানি যেমন: প্রাণ জেলি ও জুস উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছে । শিকড়, গাছের বাকল, পাতা এবং অপরিপক্ব ফল কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য পেটের পীড়া নিরাময়ে কাজ করে।

বৃক্ষ পরিবেশ ও প্রকৃতি

সুনিষ্কাশিত উঁচু জমি ও মাঝারি উঁচু জমি পেয়ারা চাষের জন্য উপযোগী। কাঁকরযুক্ত বেলে দো-আঁশসহ কাদাযুক্ত বিস্তৃত মাটিতে জন্মাতে সক্ষম। বৈরী পরিবেশ সহ্য করতে পারে। অধিক লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। দোআঁশ মাটি ও নিষ্কাশনের সুব্যবস্থাযুক্ত স্থানে ভালো হয়। এই ফল চাষে সর্বনিম্ন ও সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাপমাত্রা ১০-৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বাপেক্ষা উপযোগী বৃষ্টিপাত ৭০০-৩৭০০ মিলিমিটার। চাষ উপযোগী পিএইচ মান ৪.৫-৮.২।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশে পেয়ারার বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় জাত আছে। স্থানীয় জাতের মধ্যে-স্বরূপকাঠি, কাঞ্চননগর, মুকুন্দপুরী। উন্নত জাতের মধ্যে কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা-২ অন্যতম।

কাজী পেয়ারা: ফল আকারে বেশ বড়। ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। পরিপক্ব ফল হলুদাভ সবুজ এবং ভেতরের শাঁস সাদা। এ ফল ৭-১০ দিন ঘরে সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। কাজী পেয়ারা খেতে সামান্য টক।

বারি পেয়ারা-২: গাছ ছাতাকৃতি ও কাজী পেয়ারার চেয়ে খাটো হয়। পাতার অগ্রভাগ সুচালো। এ জাতটি বর্ষাকাল ও শীতকাল দুবার ফল দেয়। পেয়ারা খেতে সুস্বাদু ও মিষ্টি।

চারা তৈরি

গুটি কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করা হয়।

সার ব্যবস্থাপনা

সুপারিশকৃত উন্নত জাতের জন্য

সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						
গাছের বয়স (বছর)	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	জৈব সার (কেজি/গাছ/বছর)
রোপণের পূর্বে (গর্তে)	-	৫০	-	-	-	৫
১	৪৬	৫০	৫০	১০	৫	৫
২	৯২	৫০	৫০	-	-	৫
৩	১৩৮	৫০	১৫০	১০	৫	৭
৪	২০০	৮০	২০০	-	-	১০
৫	২৩০	১০০	২৫০	১০	৫	১০
৫ এর বেশি	২৩০	১০০	২৫০	১০	৫	১২

সূত্র: সার সুপারিশমালা হাত বই-২০১৮, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

প্রয়োগ পদ্ধতি

- সুপারিশকৃত জৈব সার এবং টিএসপি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে পানি দেওয়া দরকার হবে।
- বাড়ন্ত গাছের জন্য সুপারিশকৃত সার তিন ভাগে মাঘ-ফাল্গুন-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গোড়া থেকে চারদিকে ডালপালা বিস্তারের জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

ফল সংগ্রহের পর, রোগাক্রান্ত ও মরা শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করে ফেলতে হয়। তাতে নতুন নতুন কুঁড়ি জন্মায়। পেয়ারা গাছে প্রতি বছর প্রচুরসংখ্যক ফল দিয়ে থাকে। তাই ফল মার্বেল আকৃতি হলেই কিছু ফল ফেলে দেওয়া দরকার।

মিশ্র ফল বাগান পরিচর্যায় প্রকল্প কর্মীর পরামর্শ প্রদান

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

খরার সময় ২-৩ বার পানি সেচ দিতে হয়। আগাছা পরিস্কার করতে হয়। পেয়ারা গাছের পাতা, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফলে এ্যানথ্যাক্সনোজ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এমনটি হয়ে থাকে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম: পেয়ারার এ্যানথ্যাক্সনোজ

ক্ষতির নমুনা: পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ফলের গায়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ফল অনেক সময় ফেটে যায়। তাছাড়া এ রোগে আক্রান্ত ফলের শাঁস শক্ত হয়ে যায়।

অনুকূল পরিবেশ: বাতাস ও বৃষ্টির মাধ্যমে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

বিস্তার: গাছের পরিত্যক্ত শাখা-প্রশাখা, ফল এবং পাতায় এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে এবং পরে বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার: গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হয়। গাছে ফুল ধরার পর টপসিন-এম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার ভালোভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফসল তোলা

সবুজ থেকে হলদে সবুজ রং ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়।

ছবি: ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

আপেলকুল

কুলের ইতিহাস বেশ সুপ্রাচীন। চার হাজার বছর পূর্বেও চীন দেশে কুলের চাষ প্রচলিত ছিল। পৃথিবীতে যে কটি ফল দিয়ে আদিম খাদ্য সরবরাহ হয় কুল তার মধ্যে অন্যতম। এ গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। দক্ষিণাঞ্চলের মাটি এই ফল চাষের অত্যন্ত উপযোগী। ইতোমধ্যে এ অঞ্চলে কুল খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং চাষে ব্যাপক সাড়া মিলছে। প্রতিটি বাড়িতে কুল উৎপাদনে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। ছোট পরিবার বাজারে কুল বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। আজকাল উচ্চমানের আপেলকুলের ব্যাপক আবাদও শুরু হয়েছে এবং অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। তাই আপেল কুলকে 'দারিদ্র্য বিমোচনের' ফল বলা যায়।

কৃষি পরিবেশ ও প্রকৃতি

উঁচু সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি এই ফল চাষের উপযোগী। রূঢ় প্রাকৃতিক পরিবেশে বেশ অভিযোজিত ফল এটি। তাই বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী কলাপাড়া উপজেলা থেকে উত্তরের তেঁতুলিয়া উপজেলা পর্যন্ত এই ফলের চাষ বিস্তৃত। হাজার মিটার উচ্চতায় পাহাড়ি জঙ্গলে, পাহাড়ের পাদদেশে চাষ হতে দেখা যায়। উষ্ণ ও মৃদু শীতপ্রধান অঞ্চল পর্যন্ত এর চাষ বিস্তৃত। ফল চাষে সর্বনিম্ন ও সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাপমাত্রা ১০-৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বাপেক্ষা উপযোগী বৃষ্টিপাত ২৫০-২০০০ মিলিমিটার। তীব্র ও দীর্ঘ আলো দিবস উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফল দেওয়ার জন্য বেশ উপযোগী। খুলনা, রাজশাহী, নওগাঁ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আধুনিক কুল চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। রংপুর, সিলেট, ঢাকা, গাজীপুর, পাবনা ও পটুয়াখালী জেলায় কুল চাষ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চারা তৈরি

দু'ভাবে বংশ বিস্তার করা যায়। বীজ থেকে এবং কলম তৈরি করে। কলমের চারা উত্তম কারণ এতে বংশগত গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে। বলয়, তালি অথবা টি-বাডিং- এর মাধ্যমে কলমের চারা তৈরি করা যায়।

বৈজ্ঞানিক পরিচয় ও বিস্তৃতি

এটির বৈজ্ঞানিক নাম *Ziziphus mauritania* বাংলাদেশে কুলের বেশ কয়েকটি জাত চাষ হচ্ছে: নারিকেলি কুল, কুমিল্লা কুল, রাজশাহী কুল, ঢাকা-৯০ কুল, আপেল কুল, বাউ কুল, সাতক্ষীরা কুল, রাজশাহী কুল, বারি কুল-১, বারি কুল-২, থাই কুল, তাইওয়ান কুল ইত্যাদি।

ফলের পুষ্টি উপাদান

খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কুলে ৭৩.২ গ্রাম জলীয় অংশ, মোট খনিজ পদার্থ ১ গ্রাম, ১০৪ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২.৯ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম চর্বি, ২৩.৮ গ্রাম শর্করা, ১১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.০২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২ এবং ৫১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান থাকে।

চারা রোপণ

মধ্য মাঘ থেকে মধ্য চৈত্র এবং মধ্য শ্রাবণ থেকে মধ্য ভাদ্র চারা তৈরির উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের মাস খানেক আগে চারিদিকে ১ মিটার গর্ত তৈরি করে সার প্রয়োগ করতে হয়। লাইন থেকে লাইন এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১ মিটার রাখা দরকার।

সার ব্যবস্থাপনা

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈব সার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে (গর্তে)	-	৫০	-	-	-	-	১২
১-২	১৩৫	৫০	১২৫	১৫	১৫	১.০	৫
৩-৪	২২৫	৮০	২০০	২০	২০	১.৫	৭
৫-৬	৩৩৮	১৪০	৩৫০	২৫	২৫	২.০	১০
৭-৮	৪৫০	১৭০	৪২৫	৩০	৩০	২.৫	১২
৮ এর বেশি	৫৬৩	২০০	৫০০	৪০	৪০	২.৫	১৫

সূত্র: সার সুপারিশমালা হাত বই-২০১৮, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

প্রয়োগ পদ্ধতি

সুপারিশকৃত জৈব সার এবং টিএসপি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে পানি দেওয়া দরকার হবে। বাড়ন্ত গাছের জন্য সুপারিশকৃত সার তিন ভাগে মাঘ-ফাল্গুন,বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ডালপালা বিস্তারের জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ছাঁটাই

কুল গাছের বৃদ্ধি ও পরিমিত ফল ধারণের জন্য ডাল ছাঁটাই একটি জরুরি কাজ। ঠিকমতো ছাঁটাই না হলে বাগান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কলম মাটিতে লাগানোর পর একটি সতেজ ও বাড়ন্ত ডালকে উপরের দিকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনমতো সতেজ ডাল রেখে বাকিগুলো কেটে দিতে হবে। এ কাজে কাঁচি ব্যবহার করতে হবে ও কাঠি দিয়ে মূল গাছকে খাড়া রাখতে হবে। গাছ কাটতে হবে সমান করে, যাতে মূল গাছের কোনো বাকল বা ছাল না উঠে এবং মূল গাছের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে খুব সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে। কাটা অংশটি কাঁচা গোবর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এরপর কাণ্ডটিতে প্রচুর নতুন কুশি জন্ম নিবে। ফলে উপরের ২ ফুট অংশের নতুন গজানো শাখা-প্রশাখায় গাছটি ছাতার মতো আকার নিবে এবং এক পর্যায়ে একটি ঝাঁকড়া গাছ হবে। প্রতি বছর মার্চে গাছ ছাঁটাই করতে হবে। বড় ডাল সাবধানে করাত দিয়ে কাটতে হবে। কুল গাছে সবসময় নতুন গজানো শাখায় মুকুল আসে। এজন্য নিয়মিত ছাঁটাইয়ের ফলে গাছে বেশি পরিমাণ নতুন শাখা-প্রশাখা গজাবে ও সেই সাথে বেশি পরিমাণ ফল ধরবে।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

শুকনা মৌসুমে বিশেষ করে ফল ধরার সময়ে মাসে ১ বার সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। ফল ধরার পর ১৫ দিন পর পর সেচ দিলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে। তাছাড়া গাছের গোড়ায় বোরিক এসিড প্রয়োগ এবং নালার আগাছা সবসময় পরিস্কার রাখা প্রয়োজন। চারা গাছের কাঠামো মজবুত রাখার জন্য প্রথম বছরে গাছের গোড়া থেকে ৭৫ সেন্টিমটার উঁচু পর্যন্ত কোনো ডালপালা রাখা যাবে না।

রোগ ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম: কুল গাছের পাউডারি মিলডিউ, এটি ছত্রাকজনিত একটি রোগ। এর আক্রমণে ফলন অনেক কমে যায়।

ক্ষতির নাম: আক্রান্ত ফুল ও ফল গাছ থেকে ঝরে পরে।

অনুকূল পরিবেশ: গাছের পরিত্যক্ত অংশে এবং অন্যান্য পেষক উদ্ভিদে এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে। এটি বাতাসের মাধ্যমে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।

ফসল তোলা

বিস্তার: উষ্ণ ও ভিজা আবহাওয়ায় বিশেষ করে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

মধ্য পৌষ থেকে মধ্য চৈত্র মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ফলের রং হাল্কা সবুজ বা হলদে হলে সংগ্রহ করতে হয়।

ব্যবস্থাপনা: গাছে ফুল দেখা দেওয়ার পর থিওভিচ ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম বা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। পরবর্তী ১৫ দিন পর পর দুইবার স্প্রে করতে হবে।

উচ্চ ফলনশীল মরিচ চাষ

মরিচ একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় মসলা এবং সার্বজনীন অর্থকরী ফসল। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফসল। খ্রিষ্টপূর্ব সাত হাজার সালে এর চাষের সূচনা হয়েছিল বলে জানা যায়। Capsaicin নামক একটি দ্রব্য এর ঝালের জন্য দায়ী। খাবার সুস্বাদু, রঙিন ও মুখরোচক করতে এর জুড়ি নেই। মসলা ফসল হিসেবে মাঠে এবং বসতবাড়িতে প্রধানত শীতকালে আবাদ করা হয়। কিন্তু সারা বছরই ফল ধরে। শীতকালে মরিচের চাষ হলেও কতগুলো জাত সারা বছরই চাষ করা চলে। দক্ষিণাঞ্চলে মরিচ আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ অল্প খরচে স্বল্প সময়ে কৃষক লাভবান হয়। পাশাপাশি উফশী জাত প্রবর্তনের ফলে এর গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বসতবাড়ির খোলা জায়গায় বা টবে চাষ করা চলে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মরিচের বার্ষিক উৎপাদন ঊর্ধ্বগতি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রবি মৌসুমে ১৩,৪২৭৯ হেক্টর জমিতে ৩০,৮৩৯৪ মেট্রিক টন মরিচ উৎপাদিত হয়েছে।

কেন জলবায়ু সহনীয়

দক্ষিণাঞ্চলে রোপা আমন ধান কাটার পর মরিচ চাষ করা সম্ভব। চরাঞ্চলের পতিত জমিও মরিচ চাষে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে টিকে থাকতে পারে। খানিকটা লবণ সহিষ্ণু। মরিচ একমাত্র ফসল যা প্রতিটি গর্তে ২-৩ টি চারা লাগানো হয় এবং উন্নত বেডে চাষ করা হয়। বৃষ্টি-বাদল ঝুঁকির শেষের দিকে এবং নতুন জোয়ার-ভাটা আসার পূর্বেই ফসল তোলা যায়। কৃষক সরাসরি কাঁচা ও পাকা মরিচ ভালো বাজারমূল্যে বিক্রয় করতে পারে। এই অঞ্চলের মরিচ সরাসরি ঢাকায় বাজারজাত করা হয়।

মরিচের পুষ্টি উপাদান

কাঁচা-শুকনা উভয় প্রকারের মরিচেই বিভিন্ন মানের পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কাঁচা মরিচের বেশি ভিটামিন সি থাকলেও অন্যদিকে শুকনা মরিচে ভিটামিন 'এ' ও 'বি' অনেক বেশি। ভিটামিন সি এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর। খাদ্যোপযোগী প্রতি-১০০ গ্রাম কাঁচা মরিচ ০.১ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ২৯.০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৩.০ গ্রাম শর্করা, ৩০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৮০ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ১.২ মিলিগ্রাম লৌহ, ১৭৫ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন, ০.১৯ এবং ১১১ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান থাকে।

কৃষি পরিবেশ ও মাটির প্রকৃতি

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল	মাটির প্রকৃতি	পিএইচ মান	জৈব পদার্থ	লবণ সহনশীলতা
গঙ্গা জোয়ার প্লাবনভূমি-১৩	উঁচু জমি, রৌদ্রোজ্জ্বল, উর্বর ও নিকাশযুক্ত দো-আঁশ মাটি ও চর জমিতে চাষ করা যায়। মরিচ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।	খারিও মাটি ৬-৭	সাধারণত কম	আংশিক লবণ সহিষ্ণু
নতুন মেঘনা মোহনা প্লাবনভূমি-১৮, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নোয়াখালী, ভোলা	নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকলে এঁটেল মাটিতে মরিচ চাষ করা যায়। চাষের জন্য ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উপযোগী।	খারিও মাটি ৬-৭	সাধারণত কম	আংশিক লবণ সহিষ্ণু

জাত নির্বাচন

মরিচের মধ্যে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। মরিচের ব্যবহারভিত্তিক ভাগ-দুইটি যথা: ঝাল মরিচ ও মিষ্টি মরিচ। বারি মরিচ ১ (বারি লংকা) উচ্চ ফলনশীল জাত (ঝাল মরিচ)। বারি উদ্ভাবন করেছে। এ জাত সারা বছরই চাষ উপযোগী।

- **ঝাল মরিচ:** এর স্থানীয় অনেক জাত আছে যেমন: ছোট মরিচ, বড়/ লম্বা মরিচ, পাটনাই মরিচ, ধানী মরিচ, কালো মরিচ, সাহেব মরিচ, সূর্যমুখী, উবধা, বালুঝুরি ইত্যাদি। সারা বছরই এ মরিচ জন্মে।
- **মিষ্টি মরিচ:** সর্বত্র সমভাবে এ মরিচ জন্মে না। এর জাত: রুবি কিং, ওয়ার্ল্ড বেটার, চায়নিজ জায়েন্ট ইত্যাদি।
- **জমি প্রস্তুত:** ৪-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে নিতে হয়। তবে গভীর চাষ বেশ ভালো ফলন দেয়। কেননা গভীরভাবে চাষ করা হলে মরিচের প্রধান মূল মাটির গভীরে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে মরিচ খরা পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে।

বীজ বপন/চারা তৈরির জন্য বীজতলা তৈরি

মরিচ দুইভাবে চাষ করা যায়। যেমন: ১. সরাসরি বীজ বপন করে এবং ২. বীজতলায় চারা উৎপাদন করে।

বীজতলায় চারা উৎপাদন পদ্ধতি

বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হলে (১০ X ৩) ফুট আকারের বীজতলা তৈরি করতে হয়। এই সাইজের বীজতলায় ১০ কেজি গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম এমওপি সার দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলায় বপনের ৬-১২ ঘণ্টা আগে বীজ ভিজিয়ে রাখা দরকার। বীজ বপনের পূর্বে পানি ঝরিয়ে ঝরঝরে করে শুকনো ছাই/বালি মিশিয়ে বীজতলায় বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর আঁচড়া দিয়ে আড়াআড়ি মাটি টেনে দিতে হয়। বীজতলার চারপাশ দিয়ে কেরোসিন/ডিপটেরেক্স/ক্যালথেন জাতীয় বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হয়, তাতে পিঁপড়া ও উইপোকা দমন হয়।

বীজ বপন/চারা রোপণ করার সময়

মরিচ	রবি মৌসুম	খরিপ মৌসুম
ঝাল মরিচ	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর (চারা তৈরি)	মার্চ- এপ্রিল (চারা তৈরি)
	জুন-সেপ্টেম্বর (বীজ বপন)	মার্চ- এপ্রিল (বীজ বপন)
মিষ্টি মরিচ	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর (চারা তৈরি) জুন-সেপ্টেম্বর (বীজ বপন)	এ মৌসুমে উপযোগিতা কম

বীজের হার (প্রতি একরে)

পদ্ধতি	বীজ-গ্রাম/একর	মন্তব্য
চারা তৈরি করে উৎপাদন	১৬০-২৪০	চারা তৈরিতে এক একরের জন্য ৮-১০টি ১০X৩ ফুট আকারের বীজতলা প্রয়োজন।

চারা রোপণের বয়স

রবি মৌসুমে চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন এবং খরিপ মৌসুমে চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে ভালো হয়।

চারা রোপণের দূরত্ব

খরিপ মৌসুমে বড় জাতের গাছের জন্য ৬০-৭৫ সেমি দূরত্বে সারি এবং সারিতে চারা হতে চারা ৩০-৪৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

চারার বয়স দেখে বা ৫-৬ পাতাবিশিষ্ট হলে চারা রোপণ করতে হয়। চারা উঠানোর অন্তত ১ ঘণ্টা আগে বীজতলায় হাল্কা সেচ দিয়ে মাটি রসালো করে নিতে হয়। বাঁশের তৈরি ফলা/লোহার ফলা দিয়ে চারা তুলতে হয়। এতে চারা কম আঘাত পাবে এবং শিকড় কম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। পড়ন্ত বেলায় চারা তুলে সাথে সাথেই রোপণ করা উত্তম। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি হাল্কাভাবে চেপে দিয়ে সেচ দিতে হবে যাতে চারা সহজেই লেগে উঠতে পারে।

সারের মাত্রা ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি

মাটির মান	সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)						জৈব সার
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাসিয়াম	সালফার	জিংক	বরিক এসিড	টন/হেক্টর
সর্বোত্তম মাটি	০-৩২	০-১৫	০-২৫	০-৫	০-০.৫	-	
মধ্যম মানের মাটি	৩৩-৬৪	১৬-৩০	২৬-৫০	০-১০	০.৬-১.০	০.০-০.৭	৩
কম উর্বর মাটি	৬৫-৯৬	৩১-৪৫	৫১-৭৫	১১-১৫	১.১-১.৫	০.৪-১.৪	
খুব কম উর্বর মাটি	৯৭-১২৮	৪৬-৬০	৭৬-১০০	১৬-২০	১.৬-২.০	১.৫-২.১	

সূত্র: সার সুপারিশ হাতবই-২০১৮।

উপরিভাগে সার প্রয়োগ

সার জমিতে ছিটিয়ে হাল্কাভাবে কোদাল দিয়ে মাটি সারিতে তুলে দিতে হবে। এতে সারি কিছুটা উঁচু হবে, যা সেচ ও নিষ্কাশনে সহায়ক এবং জমিতে রস ধরে রাখবে, ফলে খরা অবস্থায় গাছ টিকে থাকবে।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

জমি আগাছামুক্ত এবং মাটি ঝুরঝুরে রাখলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। মাটি চটা বা শক্ত আস্তর পড়া বন্ধ করার জন্য মালচিং করলে খরাতেও গাছ দুর্বল হবে না। খরিপ মৌসুমে পানি নিষ্কাশন ও রবি মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

পাতা কোঁকড়ানো রোগ: পাতা কুঁকড়ে যায়, পাতা ছোট ও হলদে হয়। বয়স্ক পাতা শক্ত ও মচমচে হয়। গাছ ছোট ও বিকৃত হয়, ফুল ও ফল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

দমন: সাদা মাছি-এর ভাইরাস জীবাণু ছড়ায়, তাই মাছি দমন করতে হবে।

মরিচের মড়ক রোগ: ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত গাছের ডাল শুকিয়ে যায়। পরে ছাল ও মরিচে দাগ পড়ে এবং আক্রান্ত অংশ পচে যায়।

উইল্ট রোগ: এ রোগে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থা: উভয় প্রকার রোগের জন্য রিডোমিল/ ব্যাভিস্টিন/ কপারঘটিত ছত্রাকনাশক ৭-১৫ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

মরিচ সংগ্রহ

চারা রোপণের ৩০-৪৫ দিন পর ফুল আসতে থাকে এবং ফুল হওয়ার ২০-২৫ দিন পর হতে মরিচ সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। কাঁচা মরিচ হিসেবে পুষ্ট হলেই সংগ্রহ করা যায়। পাকা মরিচ (লাল হলে) সংগ্রহ করে রোদে শুকায়ে নিতে হয়। ৪০ কেজি পাকা মরিচ শুকিয়ে ৯-১০ কেজি শুকনা মরিচ পাওয়া যায়।

বাজারজাতকরণ

পরিপুষ্ট মরিচ বিকালে সংগ্রহ করে ছায়ায় বা রাতে খোলা আকাশের নিচে মেলে রাখতে হয়। সূর্য উঠার আগে ট্রে বা চটের বস্তায় বাজারে নেওয়া দরকার। প্রতি বস্তা ২০ কেজিতে সীমাবদ্ধ রাখা ভালো। মরিচ বেশি সময় ধরে সংরক্ষণের জন্য ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হয়। তবে মরিচে পানি দিলে সংরক্ষণ সময়কাল কমে যায়। শুকনো মরিচ বায়ুরোধী পলিথিন ব্যাগে ২-৩ মাস সংরক্ষণ করা যায়। মাঝে রোদে ৪-৫ ঘণ্টা শুকিয়ে ৫-৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

লাভ

এটি সবচেয়ে উচ্চমূল্যের মসলা ফসল। চাষ করে ভালো দাম পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

১. সবজি বিজ্ঞান: মোহাম্মদ মমিনুর রশিদ।
২. কৃষিতথ্য সার্ভিস

ড্রাগন ফল

আজকাল যে কটি বিদেশি ফল কৃষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার মধ্যে ড্রাগন অন্যতম। একথা বিবেচনায় রেখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ক্যাকটাস জাতীয় ড্রাগন ফল আবাদ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক ও গরিব কৃষক এ ফল চাষ করে লাভবান হতে পারেন। এর জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। সারা বছর উঁচু জমিতে বা বসতবাড়িতে ব্যাগে বা মুক্ত স্থানে চাষ বৃদ্ধি সম্ভব। দেশের ব্যাপক ফলের চাহিদা এবং উচ্চমূল্যের কথা বিবেচনা করে আইসিবিএএআর এ ফলটি উপকূলীয় এলাকায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক পরিচয় ও বিস্তৃতি

ড্রাগন ফলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় *Hylocereus undatus* (লাল ত্বক সাদা শাঁস), *Hylocereus polyrhizus* (লাল ত্বক রঙিন শাঁস), *Selenicereus megalanthus* (হলুদ ত্বক সাদা শাঁস), ইংরেজি নাম Dragon fruit। ভিটামিন সি ও খনিজ পদার্থসমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে জলীয় অংশ ৮৫.৩০ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ১.৩০ গ্রাম, ৬৭.৭০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১.১০ গ্রাম আমিষ, ১২.২০ গ্রাম শর্করা, ০.৫৭ গ্রাম চর্বি, ১০.২০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৩.৩৭ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.০১ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন, ০.০৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২ এবং ২২.০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান থাকে।

কেন জলবায়ু সহনীয়

উপকূলীয় এলাকায় মৌসুমি খরার কারণে ফল চাষ বাধাগ্রস্ত হয়। ড্রাগন ফল কিছুটা খরা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে বলে উপকূলীয় এলাকায় এর চাষ ভালো হচ্ছে। এমনকি শহর এলাকার ছাদেও চাষ হচ্ছে। এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলে এর চাষ বৃদ্ধি প্রান্তিক জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব। উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ড্রাগন ফলের চাষ সম্প্রসারণ সময়োপযোগী এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

অর্থনৈতিক ব্যবহার

এটি পুষ্টি ও খাদ্য মানে অতুলনীয়। সব ধরনের ডায়েটের জন্য এ ফলটি উপযুক্ত। এটি শরীরের জন্য আঁশ সরবরাহ করে যা পেটের পীড়া এবং লিভারের জন্য উত্তম। ডায়াবেটিক রোগীরা এ ফল খেয়ে শরীরের রক্তের গ্লুকোজকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটিতে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা নিয়মিত খেলে মানব শরীরে ক্যান্সার প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। জুস তৈরিতে এ ফলটি অত্যন্ত উপযোগী। এ ফল সালাদের সঙ্গে ব্যবহার হয়ে থাকে। কাঁচা ফলও সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

জাত

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সফলভাবে চাষ করার জন্য বারি-১, বাউ ড্রাগন ফল-১ (সাদা), বাউ ড্রাগন ফল-২ (লাল) ও বাউ ড্রাগন ফল-৩ (পিংক) নির্বাচন করা যেতে পারে।

বাউ ড্রাগন ফল-১ (সাদা)

বংশবিস্তার

(১) বীজ দিয়ে বংশবিস্তার: বীজ দিয়ে বংশবিস্তার লাভজনক হলেও এতে ফল ধরতে বেশি সময় লাগে। তাছাড়া গুণ ও মাতৃ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। পরিপুষ্ট পাকা ফল সংগ্রহ করে লম্বালম্বি/আড়াআড়িভাবে কেটে বীজ বের করতে হবে। এরপর বীজগুলোকে ধুয়ে শুকাতে হবে। পরে চারা তৈরির জন্য বীজ পলি ব্যাগে বা বীজতলায় ফেলতে হবে। এ চারাগুলো ৪-৫ মাস পরে মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হবে।

বীজ সংগ্রহের জন্য আড়াআড়িভাবে কাটা পাকা ফল

সংগৃহীত বীজ শুকানো হচ্ছে

পলিথিন দিয়ে ফল ব্যাগিং

(২) কাটিং: এর সফলতার হার প্রায় শতভাগ এবং ফলও তাড়াতাড়ি ধরে। সাধারণত বয়স্ক এবং শক্ত শাখা ০.৫-১.৫ ফুট লম্বা করে কেটে এবং ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে হালকা ছায়াযুক্ত বেলে-দোআঁশ মাটিতে গোড়ার দিকের কাটা অংশ পুঁতে সহজেই চারা উৎপাদন করা যায়।

সরাসরি মূল জমিতে কাটিং লাগিয়ে চারা তৈরির প্রক্রিয়া

২০ থেকে ৩০ দিন পরে কাটিং-এর গোড়া থেকে শিকড় বেরিয়ে আসবে । তখন এটা মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হবে। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাটিংকৃত কলম সরাসরি মূল জমিতে লাগানো যায়।

চারা লাগানোর জন্য মাদা তৈরি

মাদার দুই প্রান্ত দুই ফুট এবং গভীরতা দুই ফুট হতে হবে। গর্ত তৈরি করার সময় উপরের ৩০ সে.মি. গভীরতার মাটি এক পাশে এবং নিচের মাটি গর্তের অন্য পাশে রাখতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)					(গ্রাম/গাছ/বছর)	জৈব সার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	*টিএসপি*	*এমওপি*	*জিপসাম*	*বরিক এসিড*		
পূর্বে (গর্তে)	-	২০	১০	৫৬	-	৩০	১৫
১-২	৭৫	৫০	১০০	-	১.০	১০	২
৩-৪	১০০	৬০	১২০	১০	১.৫	১২	৩
৫-৬	১২৫	৭৫	১৫০	১৫	২.০	১৫	৪
৭-৮	১৫০	৯০	২০০	২০	২.৫	২২	৫
৮ এর বেশি	১৭৫	১০০	২৫০	২৫	২.৫	২৫	৬

সূত্র: বিএআরআই এবং সার সুপারিশ হাতবই-২০১৮।

জমি প্রস্তুতকরণ

- গর্তে চারা লাগানোর ২০-৩০ দিন আগে প্রতি গর্তে ৩০-৪০ কেজি পচা গোবর বা জৈব সার ভালোভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।
- বড় গাছের জন্য সুপারিশকৃত সার সমান দুই ভাগে বৈশাখ এবং আশ্বিন মাসে গাছের চারপাশে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।
- ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি ১০০ গ্রাম করে এবং জিপসাম, বোরাক্স ও জিঙ্ক সালফেট ১০ গ্রাম দিয়ে গর্তের মাটি উপরে-নিচে ভালোভাবে মিশায়ে রেখে দিতে হবে।
- গাছ লাগানোর পর গাছের গোড়ায় নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া ও ধানের তুষ বেশি করে ব্যবহার করতে হবে।
- পরবর্তীতে প্রতি বছরে প্রতি গাছের জন্য ৪০-৬০ কেজি পচা গোবর বা জৈব সারের সাথে ইউরিয়া ৫০ গ্রাম, টিএসপি ১০০ ও এমপি ১০০ গ্রাম এবং জিপসাম, বোরাক্স ও জিঙ্ক সালফেট ১০ গ্রাম করে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ

এটি ক্যাকটাস জাতীয় গাছ বিধায় বছরের যেকোনো সময়ই লাগানো যায়। তবে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে লাগানো উত্তম, কাটিং থেকে উৎপাদিত চারা প্রতি গর্তে ৪-৫টি করে লাগানো হয়। এক্ষেত্রে যদি ভিয়েতনাম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাহলে পিলারের চারদিকে কাটিং থেকে উৎপাদিত/বীজের চারা লাগিয়ে পিলারের সাথে পাটের বা প্লাস্টিকের রশি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।

ড্রাগন চারা রোপণ

ড্রাগন ফলের পরিচর্যা

আগাছা দমন: চারদিকে গাছের নিয়মিত আগাছা দমন করতে হবে। কোদাল দিয়ে গোড়া হালকা কুপিয়ে দিয়ে আগাছা বেছে দেওয়া ভালো। আগাছা পরিস্কার করার পর হাত বা কোদাল দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি সমান করে দিতে হবে। তবে ধানের তুষ ও নারিকেলের ছোবড়া মালচিং বা জাবড়া হিসেবে রাখতে হবে ।

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা: ড্রাগন ফল চাষে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক মৌসুমে অবশ্যই সেচ ও বর্ষা মৌসুমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে দুই সারির মাঝখানে ৫০-১০০ সে.মি. নালা তৈরি করা যেতে পারে। গাছে ফুল আসার পূর্বে শুকনা মৌসুমে সেচ প্রদান আবশ্যক। এই গাছ অতিরিক্ত পানি সহ্য করতে পারে না। আবার অতিরিক্ত খরায় সেচের অভাবে ফলের আকার ছোট হতে পারে ও ফলন কমে যেতে পারে।

প্রুনিং ও থিনিং (ছাঁটাইকরণ): ড্রাগন ফল খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা শাখা (ডগা) তৈরি করে। একটি এক বছরের গাছ ৩০-৪০টি পর্যন্ত শাখা তৈরি করতে পারে এবং ৪ বছর বয়সি একটি ড্রাগন ফলের গাছ ১৩০ টি পর্যন্ত প্রশাখা তৈরি করতে পারে। তবে শাখা-প্রশাখা উৎপাদনে উপযুক্ত থিনিং ও প্রুনিং ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। পার্শ্ব কুশি বের হলে তা কেটে দিতে হবে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১২-১৮ মাস পর একটি গাছ ফল ধারণ করে। ফল সংগ্রহের পর ৪০-৫০ টি প্রধান শাখায় প্রত্যেকটিতে ১/২টি সেকেন্ডারী শাখা অনুমোদন করা হয়। তবে এক্ষেত্রে উপ-শাখা প্রশাখাকে অনুমোদন দেওয়া হয় না। ছাঁটাইকরণ কাজ দিনের মধ্যভাগে করাই ভালো। থিনিং ও প্রুনিং করার পর অবশ্যই যেকোনো ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দ্বারা গাছ আক্রান্ত হতে পারে।

রোগবালাই ও পোকা-মাকড়

এই ফলে রোগবালাই খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে কখনো কখনো কাণ্ড ও গোড়া পচা রোগ দেখা যায়। ছত্রাক অথবা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হতে পারে। এ রোগ হলে:

- গাছের কাণ্ডে প্রথমে হলুদ রং এবং পরে কালো রং ধারণ করে;
- পরবর্তীতে ঐ অংশে পচন শুরু হয় এবং পরিমাণ বাড়তে থাকে।

রোগ দমন ব্যবস্থা: আক্রান্ত অংশ/ডাল সম্পূর্ণভাবে কেটে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। যেকোনো ছত্রাকনাশক (বেভিস্টিন, রিডোমিল, থিওভিট ইত্যাদি) ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে সহজেই দমন করা যায়।

ব্রাউন স্পট: সারকোস্পোরা প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা ড্রাগন ফলের গাছ আক্রান্ত হলে ডগা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের রোগদমন ব্যবস্থা না নিলে এক সময় সম্পূর্ণ গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা যায়।

রোগ দমন ব্যবস্থা

- আক্রান্ত অংশ বা সম্পূর্ন ডগা কেটে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।
- যেকোনো ছত্রাকনাশক (বেভিস্টিন, রিডোমিল, থিওভিট ইত্যাদি) ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে সহজেই দমন করা যায়।

পোকা-মাকড়: ড্রাগন ফলের জন্য ক্ষতিকর পোকা-মাকড় খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে মাঝে মাঝে এফিড ও মিলি বাগের আক্রমণ দেখা যায়।

- এফিড গাছের কচি শাখা ও পাতার রস চুষে খায়, ফলে আক্রান্ত গাছের কচি শাখা ও ডগার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায় ও গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।
- এ পোকা ডগার উপর আঠালো রসের মতো মল ত্যাগ করে ফলে শুটিমোল্ড নামক কালো ছত্রাক রোগের সৃষ্টি হয়।
- এতে গাছের খাদ্য তৈরি ব্যাহত হয় ফুল ও ফল ধারণ কমে যায়।

দমন ব্যবস্থা: কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫ মি.লি. ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করে সহজেই এ রোগ দমন করা যায়।

পিঁপড়া/পাখি: পরিপক্ব ফল পিঁপড়া বা পাখি খেয়ে ফেলে। তাই পরিপক্ব ফলগুলোকে যাতে পিঁপড়া না খায় সেজন্যে গাছের গোড়ায় পাউডার জাতীয় কীটনাশক দিতে হবে এবং পাখি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পলিথিন দিয়ে ব্যাগিং করতে হবে।

পিঁপড়ায় খাওয়া নষ্ট ড্রাগন ফল

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফুল থেকে ফল পরিপক্ব হতে প্রায় ৩০-৩৩ দিন সময় লাগে। ফলের ওজন ২০০ গ্রাম থেকে ১.২ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ফল যখন গাঢ় লাল রং ধারণ করে এবং হাত দিয়ে আলতো চাপে কিছুটা নরম মনে হয় তখন ফল সংগ্রহ করা যায়। ধারালো ছুরি বা সিকেচার দিয়ে ফল সংগ্রহ করা ভালো।

- ফল সংগ্রহের পর কিছুক্ষণ ঠান্ডা পরিবেশে রেখে দিতে হবে।
- ভালো, মন্দ, কাটা-ছাঁটা, ফাটা, রোগাক্রান্ত, পাখি ও পোকায় খাওয়া ফলগুলো আলাদা (Sorting) করতে হবে।
- ছোট, বড় ও মাঝারি ফল ভাগ করতে হবে; তবে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস (Grading) করতে হবে।

ফল সংরক্ষণ

ফল শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় ৫-৭ দিন স্বাভাবিক পরিবেশে অনায়াসে সংরক্ষণ করা যায়। ড্রাগন ফলের বিশেষ গুণ এই যে, গাছে পরিপক্ব অবস্থায় ৫-৭ দিন এবং ফল পাড়ার পর টেবিলে ৮-১০ দিন রাখা যাবে। এমনকি যদি ফ্রিজেও রাখা যায় তবে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়।

ড্রাগন ফল সংগ্রহ

ফসল ও লাভ

ড্রাগন ফল চাষ অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক। একবার চাষ করে ২০ বছর পর্যন্ত ভালো ফলন পাওয়া যায়। ড্রাগন ফলের উৎপাদন খরচ খুবই কম। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন, যার বর্তমান অর্থনৈতিক মূল্য প্রায় ৪-৫ মিলিয়ন টাকা। ১২-১৮ মাস বয়সের একটি গাছে ৫-২০টি ফল পাওয়া যায় কিন্তু পূর্ণবয়স্ক একটি গাছে ২৫-১০০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায় ।

বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ও আইসিবিএএআর প্রকল্পের সহযোগিতায় জলবায়ু সহনশীল উন্নত জাতের ড্রাগন ফলের চাষ করে উপকূলীয় কৃষকরা যেমনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সামর্থ্য হচ্ছে তেমনি অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. ড্রাগন ফল চাষাবাদ কলাকৌশল-ড. আব্দুর রহীম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২. http://www.agriculturelearning.com/ড্রাগন-ফল-চাষাবাদ-পদ্ধতি

সূর্যমুখী

কোলেস্টেরলমুক্ত ভোজ্যতেল সূর্যমুখী

সূর্যমুখী তেলে কোলেস্টেরল নেই। হৃদরোগীদের জন্য সূর্যমুখীর তেল খুবই উপকারী। এটি দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। এছাড়া বীজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। বীজে বিদ্যমান সেরেনিয়াম ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, মিশর, তুরস্ক, জার্মানি, ইতালি, পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশে সূর্যমুখী উৎপন্ন হয়। সুস্থ-সবল ও নীরোগভাবে বেঁচে থাকতে হলে কোলেস্টেরলমুক্ত ভোজ্যতেল সূর্যমুখী চাষের ওপর জোর দিতে হবে।

কেন জলবায়ু সহনীয়

সূর্যমুখী প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় ফসল। দক্ষিণাঞ্চলে জলাবদ্ধতার কারণে জমি থেকে পানি অপসারণ বিলম্ব হয়। বিলম্বে সূর্যমুখী বপন করা হয়। তবে ১০০-১২০ দিনের মধ্যে ফসল কর্তন করা হয়। মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত বিলম্বে ফসল কর্তন করা যায়। তখন বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তথাপিও টিকে থাকে। সূর্যমুখী পরিমিতরূপে লবণ সহিষ্ণু। হালকা বুনট থেকে ভারি বুনটযুক্ত মাটিতে চাষ করা যায়। চাষে ফসল চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে। গত ১০ বছরে দক্ষিণাঞ্চলে সূর্যমুখী চাষের প্রবণতা ও আবাদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি এর গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তেলজাতীয় ফসলগুলোর মধ্যে সূর্যমুখী পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আমাদের দেশে ভোজ্যতেলের ঘাটতি রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়। সূর্যমুখী চাষ দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় সূর্যমুখী আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রবি মৌসুমে ১৯২০ হেক্টর জমিতে ৩০৫২.১৫ মেট্রিক টন সূর্যমুখী উৎপাদিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যবহার

সূর্যমুখী তেল ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। এর বীজে ফাইবার থাকে বিধায় কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা দূর করে। উলের কাপড়, মোম ও সাবান তৈরি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এটির কাণ্ড ও মাথা থেকে চমৎকার কাগজ তৈরি হয়। সূর্যমুখীর খৈল গরু ও মহিষের উৎকৃষ্টমানের পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বীজ ছাড়ানোর পর মাথাগুলো গরু, মহিষ, হাস মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। খাদ্যোপোযোগী পরিপক্ব বীজে ৪০-৫০ ভাগ তেল সঞ্চিত থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এ তেলে ক্ষতিকারক ইরোসিক অ্যাসিড নেই। ফসল কর্তনের পর সূর্যমুখীর গাছ ও পুষ্পস্তবক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

প্রকল্পের সূর্যমুখী চাষ

সূর্যমুখী ক্ষেতে কর্মরত উপকারভোগী

কৃষি পরিবেশ ও মাটির প্রকৃতি

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল	মাটির প্রকৃতি	পিএইচ	জৈব পদার্থ	লবণ সহনশীলতা
গঙ্গা জোয়ার প্লাবনভূমি-১৩ নতুন মেঘনা মোহনা প্লাবনভূমি-১৮, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নোয়াখালী, ভোলা	বেলে দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটি, মাঝারি উঁচু এবং সুনিষ্কাশিত জমি আবাদের জন্য উপযোগী।	খারিও মাটি ৬-৭	সাধারণত কম	আংশিক-মধ্যম লবণ সহিষ্ণু

ভোজ্যতেল হিসেবে সূর্যমুখীর উপযোগিতা

- খাদ্য গ্রহণ করে আমরা যে ক্যালরি পাই বা শক্তি অর্জন করি তা মূলত তিন ধরনের খাবার থেকে আসে, যেমন: শর্করা, আমিষ এবং চর্বি বা তেল। ক্যালরির পাশাপাশি ভোজ্যতেল আমাদের খাবারকে সুস্বাদু করে এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিদ্যমান এ, ডি, ই, কে ভিটামিন পরিপাকে সহায়তা করে।
- যে সকল খাবার আমরা রান্না করে খাই যেমন: মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদি যদি পরিমাণমতো তেল দিয়ে রান্না করা না হয়, তাহলে এসবের পুষ্টিগুণ আমরা ঠিকমতো পাব না।
- শিশুদের খাদ্য তৈরিতে তেলের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। সূর্যমুখী বীজে তেলের পরিমাণ শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ।
- এতে মানবদেহের জন্য উপকারী লিনোলেনিক এসিড (৬৮%) রয়েছে। এ তেলে ক্ষতিকারক ইরুসিক এসিড নেই, যা সরিষার তেলে অনেক বেশি পরিমাণে আছে।
- সূর্যমুখী তেল হৃদরোগের জন্য খুবই উপকারী। এ ছাড়া সূর্যমুখী তেল মানুষের রক্তের কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সূর্যমুখীর বেশ কয়েকটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২টি জাত যথা: বারি সূর্যমুখী-১ এবং বারি সূর্যমুখী-২ দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

উফশী জাত	বপন-রোপণ সময়	বীজ-হার কেজি/হে:	কাঙ্ক্ষিত ফলন	জীবন কাল	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
			কেজি/টন	দিন	
বারি সূর্যমুখী-১	মধ্য অগ্রহায়ণ খরিপ -১, মৌসুমে মধ্য জ্যৈষ্ঠে (এপ্রিল থেকে মধ্য মে)	৮-১০	১.৬-১.৮	৯০-১১০	অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ সহনশীল
বারি সূর্যমুখী-২	মধ্য অগ্রহায়ণ খরিপ -১, মৌসুমে মধ্য জ্যৈষ্ঠে (এপ্রিল থেকে মধ্য মে)	৮-১০	২.০-২.৩	৯০-৯৫	তেলের পরিমাণ শতকরা ৪২-৪৪ ভাগ

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

সূর্যমুখীর ফলন বেশি পেতে হলে ৩টি সেচ দেওয়া দরকার। প্রথম সেচ বীজ বপনের ৩০ দিন পর (গাছে ফুল আসার আগে), দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫০ দিন পর (ফুল আসার সময়) এবং তৃতীয় সেচ বীজ বপনের ৭০ দিন পর (দানা পুষ্ট হওয়ার আগে) সেচ দেওয়া দরকার।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

পোকার নাম: বিছা পোকা। ছোট অবস্থায় এরা দলবদ্ধভাবে থাকে। কীড়া বা বিছা হলুদ রঙের এবং গায়ে কাঁটা থাকে। এরা সাধারণত গাছের পাতায় আক্রমণ করে। এ পোকার কীড়া দলবদ্ধভাবে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে পাতলা সাদা পর্দার মতো করে ফেলে।

ব্যবস্থাপনা: পোকা দেখার সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে পোকাসহ পাতা সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। সেচ নালায় কেরোসিন মিশ্রিত পানি থাকলে কীড়া পানিতে পড়ে মারা যায়। প্রতি লিটার পানিতে ডায়াজিনন-৬০ ইসি ২ মিলি হারে মিশিয়ে বিকালে জমিতে স্প্রে করতে হবে।

রোগের নাম: পাতা ঝলসানো রোগ।

ক্ষতির নমুনা: অলটারনেরিয়া নামক ছত্রাকের সাহায্যে এ রোগ ছড়ায়। আক্রমণের শুরুতে পাতায় ধূসর বা গাঢ় বাদামি বর্ণের অসম আকৃতির দাগ পড়ে। এ দাগগুলো একত্রে মিলিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং অবশেষে পুরো পাতা ঝলসে যায়।

সার ব্যবস্থাপনা

ভালো ফলনের জন্য সূর্যমুখীতে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে

মৌসুম	সার	সারের পরিমাণ	সারের পরিমাণ	সার প্রয়োগ পদ্ধতি
		কেজি/হেক্টর	গ্রাম/শতাংশ*	
	ইজরিয়া	১৮০-২০০	৮০০	অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের সময় বাকি অর্ধেক ২ ভাগ করে প্রথম ভাগ চারা গজানোর ২০-২৫ দিন এবং দ্বিতীয় ভাগ ৪০-৪৫ দিন পর (ফুল ফোটার পূর্বে) প্রয়োগ করতে হয়
রবি/খরিপ-১	টিএসপি/ডিএপি	১৮০-২০০	৭১৯	জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়
	এমওপি	১২০-১৫০	৮১	জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়
	জিপসাম	১২০-১৭০	-	
	জিংক সালফেট	৮-১০	২৭	জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়
	বরিক এসিড	১০-১২	-	জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়
	গোবর/কম্পোস্ট	প্রয়োজনমতো		জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়

বিস্তার: বীজ বায়ুর সাহায্যে বিস্তার লাভ করে।

ব্যবস্থাপনা: প্রতি লিটার পানির সাথে ২গ্রাম রোভরাল-৫০ ডব্লিউ পি মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করা এবং ফসল কাটার পর পরিত্যক্ত কাণ্ড, মূল ও পাতা পুড়িয়ে ফেলা।

ফসল তোলা

৯০-১১০ দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়।

কৃষক পর্যায়ের নিষ্কাশন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

সরিষার তেল ভাঙানো মেশিনেই সূর্যমুখী তেল ভাঙানো যায়। সাধারণত এই মেশিনে ৩২-৩৮ ভাগ পর্যন্ত তেল পাওয়া যায়। তেল ভাঙার পর পর তেলের পাত্রটি নাড়াচাড়া না করে প্রতি লিটার তেলের জন্য ১-২ চিমটি লবণ দিয়ে ৩-৪ দিন রেখে দিলে নিচে গাদ বা তলানি জমবে। উপর থেকে ভালো তেল ছেঁকে নিয়ে ২-৩ দিন কড়া রোদ দিতে হবে। অথবা একটি পাত্রে তেল নিয়ে হালকা গরম করে তুলে ফেলতে হবে। কোনোভাবেই তেল ফুটানো যাবে না। তেল ঠান্ডা করে একটি পরিস্কার ও শুকনো পাত্রে ঠান্ডা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। কাচের পাত্র হলে সবচেয়ে ভালো হয়।

মাঝে মাঝে রোদে দিলে এক বছরে তেল নষ্ট হবে না এবং কোনো বাজে গন্ধও হবে না। তবে দুই মাসের বেশি সংরক্ষণ না করাই উত্তম।

সূর্যমুখী চাষে আয়-ব্যয়

এটি সবচেয়ে উচ্চমূল্যের ফসল। দেশীয় তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ থেকে তেল বের করা সম্ভব। সূর্যমুখী তেলবীজের মণ প্রতি স্বাভাবিক বাজারমূল্য ১২০০-১৬০০ টাকা। খরচ বাদে গড়ে প্রতি বিঘা জমি থেকে সূর্যমুখী চাষে ৮ হাজার টাকা আয় হয়। তবে আগাম বপন, সুষম সার ও সময়মতো সেচ প্রয়োগ এবং ভালো বাজার পেলে এ আয় অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব। নিজে তেল ভাঙালে শতাংশ প্রতি উৎপাদিত ১২ কেজি বীজ (৩ টন/হেক্টর) থেকে ৪ লিটার তেল ও ৮ কেজি খৈল পাওয়া যায়। তেল সর্বনিম্ন ১৩০ টাকা লিটার ও খৈল ৩০ টাকা কেজি হিসাবে যার বাজারমূল্য ৭৬০ টাকা। শতাংশ প্রতি ২৩০ টাকা উৎপাদন খরচ ও ৬০ টাকা তেল ভাঙানো খরচ বাদ দিলে নিট লাভের পরিমাণ বিঘায় ১৫ হাজার টাকারও বেশি হবে। বাড়তি উপযোগ হিসেবে সূর্যমুখীর সাথে লালশাক, পালংশাক, ধনেপাতা আন্তঃফসল চাষ করে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র: কৃষি কথা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৯।

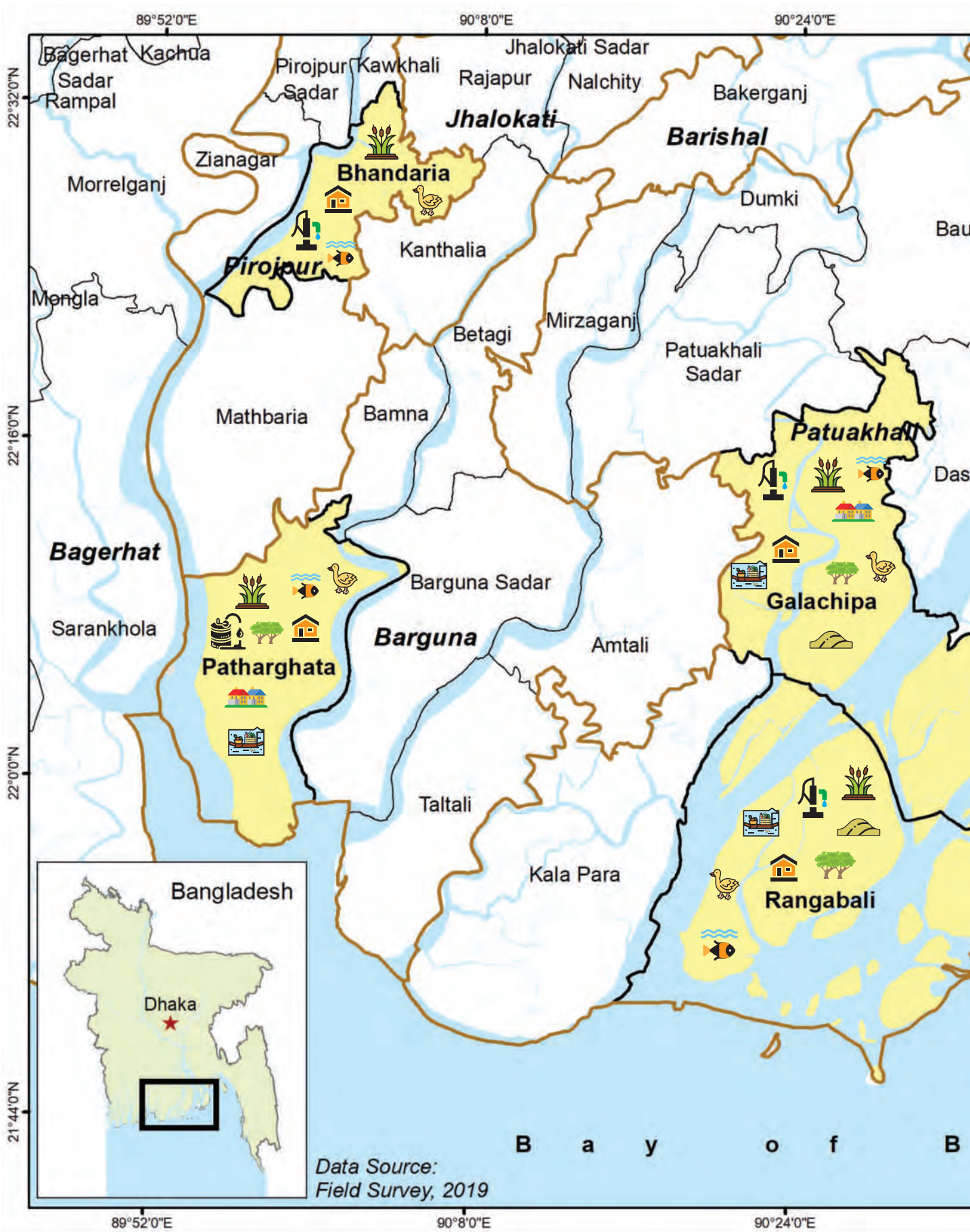
89°52'0"E
90°8'0"E
90°24'0"E
22°32'0"N
22°16'0"N
22°0'0"N
21°44'0"N
Bagerhat Sadar
Kachua
Rampal
Pirojpur Sadar
Kawkhali
Jhalokati Sadar
Rajapur
Nalchity
Bakerganj
Jhalokati
Barishal
Zianagar
Bhandaria
Morrelganj
Dumki
Kanthalia
Pirojpur
Mongla
Betagi
Mirzaganj
Patuakhali Sadar
Mathbaria
Bamna
Patuakhali
Bagerhat
Barguna Sadar
Galachipa
Sarankhola
Barguna
Amtali
Patharghata
Taltali
Kala Para
Rangabali
Bangladesh
Dhaka
B a y o f B
Data Source:
Field Survey, 2019

কর্ম এলাকা

90°40'0"E
90°56'0"E
91°12'0"E
22°32'0"N
22°16'0"N
22°0'0"N
21°44'0"N
Bhola Sadar
Daulat Khan
Lakshmipur
Ramgati
Sandwip
Subarnachar
Noakhali Sadar (sudharam)
Noakhali
Burhanuddin
Tazumuddin
Hatiya
Lalmohan
Bhola
Manpura
Char Fasson
N
W
E
S
0
10
20
km
Legend
Enrichment Plantation
3FV Model
2FVD Model
Forest Resource Protection Group
Climate Resilient Model Village
Earthen Killa
Sluice Gate
Adaptation Learning Center
Community Resource Center
Climate Resilient Agriculture
Climate Resilient Fisheries
Climate Resilient Livestock
Canal Excavation
Tube Well
Pond Sand Filter (PSF)
Waterbody
Uapzila Boundary
District Boundary
Project Area

ডাইক ক্রোপিং প্রযুক্তির মাধ্যমে লবণাক্ত উপকূলে সবজি উৎপাদন

জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে উপকূলীয় জীবিকায়ন ব্যবস্থার ওপর। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, অসময়ে বৃষ্টিপাত, অধিক বৃষ্টিপাত, খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততাসহ নানা প্রতিবন্ধকতায় আবহমানকাল ধরে চলে আসা উপকূলের কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমসমূহ স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে হাজার হাজার মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে শহরমুখী হচ্ছে। এতে শহরের উপর মানুষের চাপ বেড়ে যাচ্ছে।

'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর)' প্রকল্পটি ২০১৬ থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বাধিক জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ৫টি জেলার (নোয়াখালী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর) ৮টি উপজেলায় ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পূর্ব অভিজ্ঞতা, গবেষণা, বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় মতামত এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করে উপকূলের উপযোগী, জলবায়ু সহনশীল, অভিনব, প্রকৃতি ও প্রতিবেশভিত্তিক জীবিকায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে উপকূলের মানুষের জীবিকায়ন ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে যা দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। উপকূলে আবার ফিরে এসেছে নতুন জীবন।

জলবায়ুর প্রভাবের সাথে খাপখাওয়ানো ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে গৃহীত এই কার্যক্রমসমূহ লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য জলবায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতার সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারে। এর উৎপাদন ক্ষমতাও বহুগুণ। তাছাড়া এ ধরনের কর্মসূচি যেমন আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী, তেমনি এর উপকরণও স্থানীয় পর্যায়ে সুলভ। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগসমূহের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা প্রকল্পটির বেশিরভাগ কার্যক্রমই নারীবান্ধব।

আমাদের বিশ্বাস, 'জলবায়ু সহনশীল ও প্রতিবেশভিত্তিক উপকূলীয় জীবিকায়ন' প্রকাশনাটি জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভাব মোকাবিলায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।